বাংলা সাহিত্য চয়নিকা

উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ্যপুস্তক

অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম পরিকাঠামো 2005 -এর (NCF-2005) আধারে

BANGLA SAHITYA CHAYANIKA : *A Text Book of Bengali MIL for Class H. S. 2nd Year (New Syllabus) prepared according to National Curriculam Frame work (NCF) 2005, edited by the Editorial Board (Bengali) AHSEC and Published by Assam Text Book Corporation Guwahati-781001 on behalf of Assam Higher Secondary Education Council.*

4th Edition : 2018

প্রথম প্রকাশ
মে', ২০১১, **বৈশাখ** ১৪১৮

দ্বিতীয় প্রকাশ
মে', ২০১৪, **বৈশাখ** ১৪২১

তৃতীয় প্রকাশ
মে', ২০১৭, **বৈশাখ** ১৪২৪
(পরিবর্দ্ধিত নতুন সংস্করণ)

চতুর্থ প্রকাশ ঃ ২০১৮

@ অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, ২০১৮

প্রচ্ছদ ঃ খাইরুল বাচার

মূল্য ঃ ৬৬.০০ টাকা

অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিবের দ্বারা প্রকাশিত
বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটী-৭৮১০২১

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

● প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার যে অংশের ছাপানো কার্য,অথবা ইলেকট্রনিক মাধ্যম, যান্ত্রিক মাধ্যম, ফটো প্রতিলিপি, রেকর্ডিং কিংবা অন্য কোনো উপায়ে পুনঃপদ্ধতির সাহায্যে এর সংগ্রহ করা বা সংবর্ধন করা নিষিদ্ধ।

● এই পুস্তকের বিক্রি এই চুক্তি সাপেক্ষে করা হয়েছে যে এই পুস্তক-এর নিজস্ব প্রচ্ছদ, বাইণ্ডিং বাদ দিয়ে অন্য কোনো প্রকার ব্যবসা করতে, ভাড়া দিতে, পুনরায় বিক্রি করতে অথবা ধার দিতে পারবে না।

● পুস্তকটির উচিত মূল্য এই পৃষ্ঠায় ছাপাতে হবে। রবার ষ্টাম্প, ষ্টিকার বা অন্য কোনোভাবে অঙ্কিত সংশোধিত মূল্য বিবেচিত হবে না।

অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষে
অসম বুক হাইভ
চ্যান্সেলর কমার্সিয়েল বিল্ডিং
হেম বরুৱা পথ, পানবজাৰ, গুয়াহাটি-১

ভূমিকা

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠক্রমের সংশোধন তথা পরিবর্তন করা অসম উচ্চতর মাধ্যমিকের শিক্ষা সংসদের কর্তব্য। এটি একটি অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া। বিশ্বায়নের যুগে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখে পাঠক্রম পরিবর্তন করা হল। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ পাঠই এক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হল। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রায় সূচনাকাল থেকে আধুনিক তথা সাম্প্রতিক কালের কবি-সাহিত্যিকের কিছু লেখাও এতে সন্নিবিষ্ট করা হল। অবশ্য এই সংশোধন জাতীয় শৈক্ষিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ দ্বারা তৈরি করা জাতীয় পাঠক্রম পরিকাঠামো ২০০৫ (National Curriculum Frame Work-2005)-এর অনুসরণে করা হয়েছে।

বইটি বহুজনের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফসল। অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে সম্পাদনা সমিতির সকল সদস্যের সঙ্গে পাঠ্যপুথি প্রস্তুত সমিতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। পরবর্তী পর্যায়ে পাঠ্যপুথির বিষয়ে বিজ্ঞজনের কাছ থেকে গঠনমূলক পরামর্শ সাগ্রহে কামনা করি, যাতে সেই সংস্করণসমূহ আরো উন্নতভাবে প্রকাশ করা যায়।

বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটি

সচিব
অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ
বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটি-২১

পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনা সমিতি

প্রধান সম্পাদক

ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. মিতা চক্রবর্তী

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

কটন বিশ্ববিদ্যালয়

শান্তনু রায়চৌধুরী

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়

ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, টংলা মহাবিদ্যালয়

সর্বাণী ভৌমিক

বাংলা বিষয় শিক্ষয়িত্রী

নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ভারতীয় সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার সমতা সৃষ্টি; সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে তুলে ব্যক্তির মর্যাদা গড়ে তুলে ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের গণ পরিষদে আজ ১৯৪৯ সালে ২৬ শে নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।

পাঠ্যসূচি

অধ্যায়-১ ঃ নির্বাচিত পদ্য

Unit-I **Marks : 25** পৃ. সংখ্যা

১।	অভিসারের পূর্ব-প্রস্তুতি	গোবিন্দদাস	১
২।	অন্নদার আত্মপরিচয়	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর	৪
৩।	বঙ্গভাষা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১০
৫।	কৃপণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪
৪।	মাতৃহৃদয়	প্রিয়ংবদা দেবী	১৯
৬।	কুলিমজুর	কাজী নজরুল ইসলাম	২২
৭।	পূব-পশ্চিম	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২৭
৮।	খরা	শঙ্খ ঘোষ	৩৬

অধ্যায়-২ ঃ নির্বাচিত গদ্য

Unit-II **Marks : 35** পৃ. সংখ্যা

১।	ফুলের বিবাহ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৯
২।	স্বাদেশিকতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৭
৩।	আমার জীবনস্মৃতি	লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া	৫৯
৪।	মন্ত্রের সাধন	জগদীশচন্দ্র বসু	৬৫
৫।	মাস্টারমহাশয়	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৭৪
৬।	দিবসের শেষে	জগদীশ গুপ্ত	৮৫
৭।	গণেশ জননী	বনফুল	৯৬
৮।	ভাত	মহাশ্বেতা দেবী	১০৫

অধ্যায়-৩

Unit-III

Marks : 10 **পৃ. সংখ্যা**

১।	মূল্যবোধ শিক্ষা	ড. সুজিত বর্ধন	১১৯
২।	কৈশোরকাল ও তার উপযোগী শিক্ষা	ড. কাবেরী সাহা	১২৫

অধ্যায়-৪ ঃ ব্যাকরণ

Unit-IV **Marks : 10** **পৃ. সংখ্যা**

ক) প্রবাদ-প্রবচন ১৩৪—১৪০

খ) বাগ্বিধি-বাগ্‌ধারা

গ) প্রতিশব্দ

ঘ) সমাস

অধ্যায়-৪ ঃ রচনা

Unit-V **Marks : 10** **পৃ. সংখ্যা**

ক) অসম বিষয়ক

খ) সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক

গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক

ঘ) ক্রীড়া বিষয়ক

ঙ) সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিষয়ক

চ) ভ্রমণ বিষয়ক

ছ) সাম্প্রতিক সমস্যামূলক

জ) জীবনী বিষয়ক

অভিসারের পূর্ব-প্রস্তুতি

গোবিন্দদাস

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে তথা ব্রজবুলি ভাষায় রচিত এই পদটির মাধ্যমে ব্রজবুলি ভাষার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে এই পদটি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

কবি পরিচিতি :

মুর্শিদাবাদের তেলিয়াবুধুরিতে চৈতন্যোত্তর যুগের এইকবি জন্মগ্রহণ করেন। মাতা সুনন্দা দেবী। পিতা শ্রীচৈতন্যভক্ত চিরঞ্জীব সেন। মাতামহ পণ্ডিত দামোদর। কবি গোবিন্দদাস প্রথমে শাক্ত ছিলেন। পরে শ্রীনিবাস আচার্যের দীক্ষায় বৈষ্ণব হন। গৌরচন্দ্রিকা, গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ ও অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনা করে এঁকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'ও বলা হয়। ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনায়ও তিনি একজন দক্ষ কবি হিসেবে স্বীকৃত।

মূল পাঠ

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।

গাগরি বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।
হরি অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনি জাগি।।
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভাবিনি
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগগুরু পাশে।।
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ।।

পাঠবোধ :

বহু দুর্যোগপূর্ণ পথ অতিক্রম করে শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে হবে। এই পদটিতে তাই তিনি বাড়িতেই দুর্গম পথ অতিক্রমের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত অভিসার পর্যায়ের একটি অসাধারণ পদ। ছাত্র-ছাত্রীদের বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে। কবিতাটি ব্যাখ্যার সময় এটির অপূর্ব ধ্বনিমাধুর্য ও শব্দমাধুর্য সম্বন্ধে আলোচনা করে এজাতীয় পদরচনায় গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব বোঝাতে হবে।

শব্দার্থ ও টীকা :

কণ্টক : কাঁটা।
মঞ্জীর : নূপুর।
চীর : ছেঁড়া কাপড়।
দুতর : দুস্তর, দুর্যোগপূর্ণ।
মন্দিরে : মধ্যযুগে মন্দির শব্দটি 'বাসগৃহ' অর্থে ব্যবহৃত হত।

কর-যুগ : দুই হাত দিয়ে।
ভামিনী : নারী।
কঙ্কণ : হাতের বালা। অলংকার বিশেষ।
ফণিমুখ-বন্ধন : সাপকে বশ করার মন্ত্র।
ভুজগ-গুরু : সাপের ওঝা ; সাপুড়ে।
বধির : যে কানে শোনে না।
মুগধী : মুগ্ধা, বিহ্বল।
পরমাণ : প্রমাণ, সাক্ষী।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্যে প্রশ্ন ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)
ক) গোবিন্দদাসের আদি পদবি কী ছিল?
খ) গোবিন্দদাসকে কী উপাধি দেওয়া হয়েছিল?
গ) 'অভিসারের পূর্ব-প্রস্তুতি' পদটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
ঘ) গোবিন্দদাসের দীক্ষাগুরুর নাম কী?
২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্যে প্রশ্ন ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)
ক) গোবিন্দদাসের পিতা ও মাতামহের নাম লেখো।
খ) 'গাগরি বারি ঢারি করু পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।"— চরণটি সরল বাংলায় বুঝিয়ে দাও।
গ) গুরুজনের এবং পরিজনের কথা শুনে শ্রীরাধা কেমন ব্যবহার করেছিলেন লেখো।
৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্যে প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)
ক) 'অভিসারের পূর্ব-প্রস্তুতি' পদটির সারমর্ম তৈরি করো।
খ) "কণ্টক গাড়ি... লাগি"— ব্যাখ্যা করো।

অন্নদার আত্মপরিচয়

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য

'অন্নদার আত্মপরিচয়' কবিতাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই পাঠের মধ্য দিয়ে কবি মধ্যযুগীয় সমাজের যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন এবং সেই চিত্রে যে আধুনিক যুগের ছোঁয়া লক্ষ করা যায়, ছাত্রছাত্রীদের কাছে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে।

কবি পরিচিতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তিনি সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই একজন বিদগ্ধ কবি। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় অভিজাত রাজবংশের সন্তান এবং কৃষ্ণরায়ের উত্তরপুরুষ ছিলেন। কবির মাতার নাম ভবানী। পিতার নিঃস্ব অবস্থার জন্য তাঁর শৈশব মাতুলালয়ে কাটে। তিনি চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সেই সংস্কৃততে দক্ষ হয়ে ওঠেন। পরে ফারসি ভাষাতেও তাঁর বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কবির জীবন ছিল খুবই দুর্ভাগ্যপূর্ণ, নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের পর তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নজরে পড়েন এবং মহারাজের সভাকবি নিযুক্ত হন। তাঁর কবিত্বশক্তির জন্য মহারাজ তাঁকে 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। মহারাজ প্রদত্ত মূলাজোড়া গ্রামেই তিনি মাত্র ৪৮ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন (১৭৬০)। 'অন্নদামঙ্গল' কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। এ ছাড়া তিনি 'নাগাষ্টক', 'রসমঞ্জরী' কাব্য ও সংস্কৃত ও হিন্দি মিশ্রভাষায় 'চণ্ডী' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন।

মূলপাঠ

অন্নপূর্ণা উতরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।

পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে।।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনি।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।।
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার।।
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।।
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই।।
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।।
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।

দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল।।
যার নামে পার করে ভবপারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার।।
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ।।
পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে।।
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আল্‌তা ধুইবে পদ কোথা থুব বল।।
পাটুনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙা চরণ।।
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে।।
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়।।
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে।।
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে।।
সোনার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।।
তীরে উত্তরিল তরি তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা।।
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি।।
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল।।
হের দেখ সেউঁতীতে থুয়েছিলা পদ।

কাঠের সেঁউতী মোর হল অষ্টাপদ।।
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়।।
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার।।
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়।।
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া।।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্লা অষ্টমীতে।।
কতদিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ি কোন্দলের ত্রাসে।।
ভবানন্দ মজুমদার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোমত যাহা চাহ দিব।।
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিল বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।।
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্ব্বার ফিরে চাহে দেখিতে না পায়।।

শব্দার্থ ও টীকা :

অন্নপূর্ণা : দেবী অন্নপূর্ণা হলেন ভগবতীরই অংশবিশেষ। দেবীর এই রূপ সম্বন্ধে একটি পুরোনো কাহিনি প্রচলিত আছে। কাহিনিটি হল একদিন মহাদেব ভগবতীর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে ভিক্ষা করতে বের হলেন। কিন্তু ভগবতীর মহিমায় মহাদেবের সেদিন কোথাও অন্ন জুটল না। অন্যদিকে দেবী ভগবতী অন্নপূর্ণা নাম গ্রহণ করে কাশীতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং দরিদ্র জনসাধারণকে

অন্ন দান করতে লাগলেন। তখন শিব ভিখারির বেশে অন্নপূর্ণার কাছ থেকে অন্ন গ্রহণ করেন। কথিত আছে অন্নপূর্ণার দয়ায় কাশীতে কেউ-ই নিরন্ন থাকে না। তাই দেবীর অপর নাম 'অন্নদা'।

পাটনি : খেয়া পারাপারের মাঝি। খেয়া পারাবারের মাঝি স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ই হতে পারে। এখানে পাটনি স্ত্রীলোক। কারণ প্রথমত, মাঝির নাম ঈশ্বরী (স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ) এবং দ্বিতীয়ত, কাঁখে নিয়ে যাওয়া (সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী) এই মাঝিকে এই দুই অর্থে স্ত্রী জাতির বলে ধরা হয়।

ত্বরায় : শীঘ্র।

কুলীন : বংশমর্যাদা-সম্পন্ন, কু-তে অর্থাৎ পৃথিবীতে লীন, আগম নিগম প্রভৃতিতে লীন।

বন্দ্যবংশ : বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, বন্দনী বংশ বা দেবতা।

দ্বন্দ্ব : কলহ, বিবাদ।

পঞ্চমুখ : বাচাল অর্থে ব্যবহৃত, আবার পাঁচটি মুখ বিশিষ্ট মহাদেবও বোঝায়।

অহর্নিশ : দিনরাত।

কোন্দল : ঝগড়া, বিবাদ।

কোকনদ : পদ্ম, কমল।

সেঁউতি : নৌকার জল সেঁচবার পাত্র।

অষ্টাপদ : সোনা।

ভবানন্দ মজুমদার : মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। মোঘল সেনাপতি মানসিংহ যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলে ভবানন্দ পথ দেখিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। পরে প্রতাপাদিত্যকে বন্দি করে নিয়ে যাবার সময় মানসিংহ ভবানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং তাঁর উপকারের বিনিময়ে মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে পুরস্কারস্বরূপ জায়গিরের ব্যবস্থা করে দেন।

পুনর্বার : পুনরায়, আবার।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্যে প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) 'অন্নদার আত্মপরিচয়' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?

খ) 'পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে'— মাতার পরিচয় দাও।

গ) 'জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি'— এখানে 'জীবন-স্বরূপা' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

ঘ) 'সেঁউতী' বলতে কী বোঝ?

ঙ) 'পঞ্চমুখ' শব্দের দ্ব্যর্থবোধক দিক নির্দেশ করো।

চ) 'না মরে পাষাণ বাপ'— পাষাণ বাপটি কে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্যে প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) 'অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।'— বক্তার ভাই কে? তার সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার পৌরাণিক প্রসঙ্গটি বুঝিয়ে বলো।

খ) 'সিদ্ধিতে নিপুণ'— সিদ্ধি কথাটির দুইটি অর্থ কী কী?

গ) 'কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।'

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় যে কথা বলা হয়েছে তা বুঝিয়ে বলো।

ঘ) 'ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী'— এখানে বর্ণিত উল্লিখিত দুই ঈশ্বরীর পরিচয় দাও।

ঙ) 'কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন'— কে কার সম্পর্কে একথা বলেছেন? মন্তব্যটির প্রকৃত অর্থ কী?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্যে প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) দেবী অন্নদা হরিহোড়ের গৃহ ত্যাগ করলেন কেন? তিনি হরিহোড়ের গৃহ ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছেন?

খ) 'ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়'— কে কাকে এই কথা বলছিল? সে কীভাবে বুঝল যে উদ্দীষ্ট ব্যক্তি নিশ্চয় দেবতা?

গ) 'অন্নদার আত্মপরিচয়' পাঠটিতে তৎকালীন সমাজের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

ঘ) ঈশ্বরী পাটুনির চরিত্র সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কতদূর সার্থক হয়েছেন তা এই চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

ঙ) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো :

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'।

বঙ্গভাষা

মধুসূদন দত্ত

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

কবি মাইকেল মধুসূদন যখন ফরাসি দেশের ভার্সাই নগরে ছিলেন তখন তিনি তাঁর সহপাঠী বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর কাছে একটি পত্রে 'মাতৃভাষা' নামে একটি সনেট রচনা করে পাঠিয়েছিলেন, এইটি পরে সংশোধিতাকারে 'বঙ্গভাষা' নামে তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। এই কবিতার মাধ্যমে একাধারে ইউরোপীয় সাহিত্যের যে সনেট তার বাংলা প্রতিরূপ আমরা পাই। তদুপরি বঙ্গভাষার প্রতি কবির বিশেষ অনুরাগের যে ছবি এই কবিতায় পাওয়া যায় সেই অনুরাগকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত করবার উদ্দেশ্যে এই কবিতাটিকে পাঠক্রমে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

লেখক পরিচিতি :

মাত্র কয়েক বছরের জন্য বাংলা সাহিত্যে কাব্য-নাটক রচনা করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গ সাহিত্যে আধুনিকতার গোড়াপত্তন করেছিলেন। পৃথিবীর প্রখ্যাত ভাষাগুলিতে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং অতলস্পর্শী মৌলিক প্রতিভার খরদীপ্তিতে বাংলার কাব্য কবিতা ও নাট্য সাহিত্য নবজন্ম লাভে ধন্য হল। মধুসূদনের প্রথম সার্থক বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা' তাঁকে নাট্যকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত করল।

মধুসূদন দত্ত অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রাজনারায়ণ দত্ত। মাতার নাম জাহ্নবী দেবী। সাত বছর বয়সে মধুসূদন

কলকাতায় আসেন। এরপরই তাঁর ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়। মধুসূদন সাহিত্যরসিক ও মেধাবী ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁর দক্ষতাও জন্মেছিল যথেষ্ট। ছাত্রজীবনেই তিনি ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য বিলেতে যান এবং এই বিলেতে যাবার পূর্বেই 'শর্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রো', 'পদ্মাবতী' নাটক, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক, 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য, 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সে থাকাকালীন তিনি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন। নাটক, প্রহসন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট প্রভৃতি অনেক সাহিত্যরীতি সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তন তিনিই করেছিলেন। এই মহান কবি ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে 'মধুকবি' নামে বিশেষ পরিচিত।

মূল পাঠ

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে, ভুল কমল-কানন!

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

পাঠবোধ

'বঙ্গভাষা' বাংলা সাহিত্যের এটি সার্থক চতুর্দশপদী কবিতা। কবি বাংলা সাহিত্য ছেড়ে ইংরেজি সাহিত্যে কাব্য রচনা করে মিল্টন, বায়রনের মতো কবি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বীয় বাংলা ভাষায় যে অমূল্য রত্নরাজি আছে তা তিনি প্রথমাবস্থায় বুঝতে পারেননি। পরে কবি তা বুঝতে পেরে বাংলা ভাষার সাহিত্যরথীদের উদ্দেশে তাঁর মনের শ্রদ্ধার্ঘ্য এই কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

শব্দার্থ ও টীকা :

ভাণ্ডার : ভাঁড়ার।

কুক্ষণে : খারাপ লগ্নে বা সময়ে।

পরিহরি : বর্জন করে।

অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায় মনঃ : ঘুম, আহার ত্যাগ করে দেহ ও মনকে আন্তরিকভাবে কোনো কাজে নিযুক্ত করা।

মাতৃকোষে : মাতৃভাষারূপ কোষাগারে।

১। ক) অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) বাংলা সাহিত্যে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কী কবি নামে পরিচিত?

খ) কবি মধুসূদনের লেখা 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির নাম প্রথমাবস্থায় কী ছিল?

গ) কবির একটি বিখ্যাত নাটকের নাম করো।

ঘ) মাইকেল মধুসূদনের একটি বিখ্যাত কাব্যের নাম করো।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুইটি প্রহসনের নাম লেখো।

খ) 'কুললক্ষ্মী' বলতে কী বোঝ?

গ) চতুর্দশপদী কবিতা কী?

ঘ) 'পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'— বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে কীভাবে অর্থাৎ কী কী

সাহিত্যকীর্তির দ্বারা আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন?

খ) 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির আত্ম-অনুশোচনার কারণ নির্দেশ করো।

গ) 'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?'

এখানে 'ওরে বাছা' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? তাঁর ভিখারি দশার কারণ কী?

(ঘ) 'মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!'

মর্মার্থ বিশ্লেষণ করো।

ঙ) 'মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।'

তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

কৃপণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী। গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, গীতিকার ইত্যাদি সমস্ত পরিচয়কে ছাপিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় সর্বময় গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। 'কৃপণ' কবিতাটি 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৮ চৈত্র কবিতাটি লেখা হয়। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে এই কবিতাটি ইংরেজি অনুবাদে গীতাঞ্জলি কাব্যের ৫০ সংখ্যক কবিতা হিসাবে সংকলিত হয়। 'কৃপণ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চেতনার একটি রূপরেখা ধরা পড়েছে। কবির ঈশ্বর তাঁর ভক্তের কাছ থেকে কিছুই নেন না। ভক্ত ঈশ্বরকে যা দান করেন ঈশ্বর তা-ই তাঁকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ, ক্ষুদ্রমনা মানুষ তাঁর স্বভাব কৃপণতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। দানের মাহাত্ম্যের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মেই উল্লেখ করেছেন। নিজেকে উজাড় করে, নিঃস্ব করে সমর্পণ করতে না পারলে ঈশ্বরের দাক্ষিণ্য মেলে না। এই দর্শন ভারতের চিরকালীন বিশ্বাস সম্ভূত। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চেতনার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ পরিচয় ঘটানো এই পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য।

কবি পরিচিতি

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ মে, কলকাতার জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত ঠাকুর বাড়িতে। পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা দেবী। বাল্যকালেই তাঁর

কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি সাহিত্যের প্রতিটি শাখাকেই তিনি পত্রে-পুষ্পে বিকশিত করে তুলেছেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে লাভ করেছেন বিশ্ব সেরা নোবেল পুরস্কার। তিনি খুব উচ্চশ্রেণির চিত্রকরও ছিলেন। তাঁর ছবি সমগ্র বিশ্বে সমাদর লাভ করেছে। তাঁর বিখ্যাত রচনাবলির মধ্যে রয়েছে 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'পলাতকা', 'পূরবী', 'প্রান্তিক' প্রভৃতি কবিতা সংকলন ; 'বিসর্জন', 'রাজা', 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ইত্যাদি নাটক ; 'চোখের বালি', 'ঘরে-বাইরে', 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা', 'যোগাযোগ' ইত্যাদি উপন্যাস ; 'ছেলেবেলা', 'জীবনস্মৃতি', 'আত্মপরিচয়' ইত্যাদি আত্মজীবনী। 'গল্পগুচ্ছে'র চারটি খণ্ডে সংকলিত হয়েছে তাঁর প্রায় আশিটি ছোটগল্প।

ভারতীয় আদর্শে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামবাংলার উন্নতির জন্য 'শ্রীনিকেতন' গড়ে তোলেন। পল্লির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন এই শ্রীনিকেতনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট তিনি দেহত্যাগ করেন।

মূল পাঠ

আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব এক স্বপ্নসম লাগতেছিল চক্ষে মম—
কী বিচিত্র শোভা তোমার, কী বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাবতেছিলেম এ কোন্ মহারাজ।।

আজি শুভক্ষণে রাত পোহালো, ভেবেছিলেম তবে
আজ আমাদের দ্বারে দ্বারে ফিরতে নাহি হবে।
বাহির হতে নাহি হতে কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধনধান্য ছড়াবে দুই ধারে—
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব, নেব ভারে ভারে।।

দেখি সহসা রথ থেমে গেল আমার কাছে এসে,
আমার মুখ-পানে চেয়ে নামলে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,
হেনকালে কিসের লাগি তুমি অকস্মাৎ
'আমায় কিছু দাও গো' ব'লে বাড়িয়ে দিলে হাত।।

মরি, এ কী কথা রাজাধিরাজ, 'আমায় দাও গো কিছু'—
শুনে ক্ষণকালের তরে রইনু মাথা-নিচু।
তোমার কিবা অভাব আছে ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে!
এ কেবল কৌতুকের বশে আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হতে দিলেম তুলে একটি ছোটো কণা।।

যবে পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি— একি,
ভিক্ষা-মাঝে একটি ছোট সোনার কণা দেখি!
দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে—
তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভ'রে,
তোমায় কেন দিই নি আমার সকল শূন্য করে?।

পাঠবোধ

কবিতাটি একটি রূপকের আড়ালে বিবৃত। এক ভিখারির সঙ্গে রাজ-ভিখারির সাক্ষাৎ হয় পথের মাঝে। রাজ-ভিখারি স্বয়ং ঈশ্বর। মহামহিম ঈশ্বর তুচ্ছ ভিখারির সামনে হাত পেতেছেন। মানুষ চিরকাল ঈশ্বরের কাছে চেয়ে এসেছে। কবির ঈশ্বর নিজেই ভিখারি। তিনি ভক্তের দানের মুখাপেক্ষী। নিজেকে উজাড় করে সবটা বিলিয়ে না দিলে, তাঁর কাছে কিছুই পাওয়া যায় না। আবার পাওয়ার প্রত্যাশায় যে দান, তাকে কবি কখনোই সমর্থন করতে পারেননি। কৃপণের সঞ্চয়ে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না। সঞ্চয়ের পাত্র নিঃশেষ করে তাঁকে দান করতে না পারলে তাঁর দাক্ষিণ্য গ্রহণের ঠাঁই সংকুলান হয় না।

শব্দার্থ :

স্বর্ণরথ : সোনা দিয়ে নির্মিত রথ। এখানে ঐশ্বর্যের প্রতীক।

ধনধান্য : টাকাপয়সা।

ভার : বোঝাবহনের জন্য ব্যবহৃত যষ্টি বা লাঠি। বাঁক।

প্রসন্নতা : সন্তুষ্টি।

অকস্মাৎ : হঠাৎ। সহসা।

রাজাধিরাজ : রাজাদের রাজা।

ক্ষণকাল : অতি সামান্য সময়।

কৌতুক : ঠাট্টা। পরিহাস।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) 'কৃপণ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

খ) কবিতার 'আমি' গ্রামের পথে কী উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন?

গ) রথ থেকে নেমে রাজাধিরাজ ভিখারিকে কী বলেছিলেন?

ঘ) ভিখারি রাজাধিরাজকে কী দিয়েছিলেন?

ঙ) দিনান্তে ঘরে ফিরে ভিখারি তাঁর ভিক্ষান্নের মধ্যে কী দেখেছিলেন?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) রাজাধিরাজ রথ থেকে পথের দুধারে কী ছড়িয়ে দেবেন এবং তা নিয়ে ভিখারি কী করবেন বলে ভেবেছিলেন?

খ) রথ থামার পর রাজাধিরাজ কী করেছিলেন?

গ) রাজাধিরাজের কথা শুনে ভিখারির কী মনে হয়েছিল?

ঘ) ভিক্ষান্নের মধ্যে সোনার কণা দেখে ভিখারি কেন আক্ষেপ করেছিলেন?

ঙ) 'রাজভিখারি' বলতে কাকে চিহ্নিত করা হয়েছে?

৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) 'কৃপণ' কবিতার কাহিনি অংশ নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

খ) 'কৃপণ' কবিতায় কৃপণ কে— ভিখারি না রাজ-ভিখারি? তোমার মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও।

গ) কোন যুক্তিতে ভিখারি রাজাকে ক্ষুদ্র কণা ভিক্ষা দিয়েছিলেন এবং পরিশেষে কেনই-বা তার জন্য আক্ষেপ করেছিলেন— বিস্তৃত করো।

ঘ) 'কৃপণ' কবিতায় বর্ণিত কাহিনি অনুসারে কবির চরিত্র চিত্রণ দক্ষতার পরিচয় দাও।

ঙ) 'কৃপণ' কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

মাতৃহৃদয়

প্রিয়ংবদা দেবী

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য

উনিশ শতকের গীতিকবিতার ধারায় কিছু মহিলা কবির নাম স্মরণীয়। তাঁদের মধ্যে প্রিয়ংবদা দেবী অন্যতম। এই মহিলা কবিদের রচনার সঙ্গে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে কবিতাটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হল।

কবি পরিচিতি (১৮৭১-১৯৩৫)

জন্ম মাতামহের কর্মক্ষেত্র পাবনা জেলার গুনাইগাছায়। পিতা কৃষ্ণকুমার বাগচী। মায়ের সঙ্গে মামা বাড়িতেই তাঁর জীবন কেটেছে। মা প্রসন্নময়ী সুলেখিকা ছিলেন। আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরী তাঁর মামা। প্রিয়ংবদা দেবী ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বেথুন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং বেথুন কলেজ থেকে এফ.এ এবং ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে বি.এ পাশ করেন। ওই বছরই রায়পুরের আইনজীবী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৮৯৫ সালে বিধবা হন। ১৯০৬ সালে একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। ফলে তিনি সমাজসেবা এবং কাব্যচর্চাকে জীবনের ব্রত করে নেন। কাব্য-রচনায় রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। নারীশিক্ষা প্রচলনের জন্য তিনি একাধিক মহিলা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘকাল ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের কর্মাধ্যক্ষা ছিলেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা করেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহু কবিতা, অনুবাদ ও নানাধরনের লেখা লিখেছেন। ভাস রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা'র অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'ভক্তবাণী' নাম দিয়ে বাইবেলের বেশ কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন। জাপানের গেইশা রমণীদের জীবন নিয়ে তাঁর লেখা বড় গল্প 'রেণুকা'। রচিত কাব্যগ্রন্থ— 'রেণু', 'তারা', 'পত্রলেখা', 'অংশু', 'চম্পা ও পাটল'। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'অনাথ', 'পঞ্চুলাল', 'কথা ও উপকথা' ইত্যাদি।

মূল পাঠ

বক্ষে তব বক্ষ দিয়ে শুয়ে আছি আমি
হে ধরিত্রি জীবধাত্রি, নিত্য দিনযামী
মাতৃহৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন
প্রবাসী সন্তান লাগি ; নিয়ন্ত ক্রন্দন
তারি লুপ্ত স্পর্শ তরে, করি' দাও লয়
বিপুল বক্ষের তব মহাশব্দময়
অনন্ত স্পন্দন মাঝে, শিখাও আমায়
সে পুণ্য-রহস্যমন্ত্র— মার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি বিয়োগ-বেদন
লক্ষ কোটি সন্তানের, প্রশান্ত বদন ;
তবু ফুটাতেছে ফুল, জ্বালিছ আলোক
উজলিয়া রাত্রিদিন দ্যুলোক ভূলোক।।

পাঠবোধ

উনিশ শতকের মহিলা গীতিকবি প্রিয়ংবদা দেবীর এই কবিতাটি প্রকৃতিপ্রেমের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। কবিতাটি আলোচনার সময় গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে প্রিয়ংবদা দেবীর রচনার ওজস্বিতা, সরলতা ও সাবলীলতা সম্পর্কেও আলোচনা করা যেতে পারে। এই কবিতায় প্রকৃতি-প্রেমের সঙ্গে তাঁর নিজের পুত্রবিয়োগের ব্যথাও একীভূত হয়ে গেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

ধরিত্রী : পৃথিবী

জীবধাত্রী : জীবকে ধারণ করেন যিনি।

স্পন্দন : মৃদু কম্প, স্ফুরণ।

ভাস : সংস্কৃত সাহিত্যের নাট্যকার। 'স্বপ্নবাসবদত্তা', 'চারুদত্তম', 'দূত ঘটোৎকচ' ইত্যাদি তেরোটি নাটকের রচয়িতা।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) প্রিয়ংবদা দেবীর পৈতৃক পদবি কী ছিল?

খ) প্রিয়ংবদা দেবীর মায়ের নাম লেখো।

গ) মাতৃহৃদয় কবিতায় কাকে মা সম্বোধন করা হয়েছে?

ঘ) প্রিয়ংবদা দেবী বাইবেলের কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন। সেই গ্রন্থের নাম কী?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক-২/৩)

ক) "শিখাও আমায়
সে পুণ্য রহস্যমন্ত্র— মার মহিমায়"— নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করো।

১। বড় প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক-৪/৫)

ক) "তবু ফুটাতেছে ফুল, জ্বালিছ আলোক
উজলিয়া রাত্রিদিন দ্যুলোক ভূলোক।।"
সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

খ) 'মাতৃহৃদয়' কবিতাটির সারকথা তোমার নিজের ভাষায় লেখো।

গ) প্রিয়ংবদা দেবীর সমাজ-সংস্কারমূলক কাজের বর্ণনা দাও।

ঘ) মাতৃহৃদয় কবিতার নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

কুলি-মজুর

কাজী নজরুল ইসলাম

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি হিসাবে পরিচিত। তাঁর কবিতার বাণী জ্বালাময়। ব্যক্তি জীবনে নজরুল অজস্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম ছিল নিখাদ। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। সম্পাদনা করেছেন 'ধূমকেতু'-র মতো পত্রিকা। যে পত্রিকায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে শাণিত আক্রমণমূলক লেখা প্রকাশে ক্ষুব্ধ শাসক পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। নজরুল কারাবন্দিও ছিলেন কিছুকাল। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ। 'কুলি-মজুর' কবিতাটি 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। তাঁর কবিতায় বিদ্রোহ আছে, সেইসঙ্গে আছে সাম্যবাদের প্রতি তীব্র টান। এই সাম্যের ধারণা মানবতাবাদের দোসর। 'কুলি-মজুর' কবিতায় কবি অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। সমাজের শোষিত, অত্যাচারিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা নজরুলের কবিতার মৌল সুর। যেখানেই শোষণ, অত্যাচার নজরুল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। নজরুলের কাব্যের এই বিশেষ দিকগুলির সঙ্গে পরিচয়ই এই পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য।

কবি পরিচিতি :

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে, ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। পিতামাতার ষষ্ঠ সন্তান তিনি। নজরুলের ডাক নাম ছিল 'দুখু মিয়া'। মাত্র নয় বছর বয়সে পিতার মৃত্যুতে পারিবারিক অনটন তাঁর শিক্ষাজীবনে বাধার সৃষ্টি করে। এসময় থেকেই অর্থের সন্ধানে নানারকম কর্মের সঙ্গে নিজেকে

যুক্ত করেন তিনি। সংগীত, নাটক, সাহিত্যের চর্চাও চলতে থাকে পাশাপাশি। ১৯২২ সালে প্রকাশিত 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ নজরুলের জীবনে স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্যিকের মর্যাদা এনে দেয়। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'সর্বহারা' ইত্যাদি উল্লেখ্য। কবিতা ছাড়াও তাঁর বেশকিছু গল্প ও উপন্যাস রয়েছে। তাঁর রচিত গানের সম্ভারটি বাঙালির হৃদয়ের ধন। নাট্যকার হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল প্রশ্নাতীত। ১৯৪২ সালে তিনি বাক্‌শক্তি হারান। ক্রমে মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭৬ সালে ঢাকার পিজি হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে নজরুল জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত।

মূল পাঠ

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এম্‌নি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?

যে দধিচীদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবুসা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে!
বেতন দিয়াছ?— চুপ্ রও যত মিথ্যাবাদীর দল ;
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল!
রাজ-পথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল'ত এ সব কাহাদের দান! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা? ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা!
তুমি জান না ক' কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে!

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদের ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।
তুমি শুয়ে রবে তেতালার' পরে আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে!
সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটীর মমতা-রসে,
এই ধরণীর তরণীর হা'ল রবে তাহাদেরি বশে!
তারি পদরজ অঞ্জলি করি' মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথে চলি যার পায়ে লাগিয়েছে ধূলি!
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাখি' খুন,
লালে লাল হ'য়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ!
আজ হৃদয়ের জাম-ধরা যত কবাট ভাঙিয়া দাও,
রং-করা ঐ চামড়ার যত আবরণ খুলে নাও!
আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি ক'রে ঢুকুক্ এ বুকে, খুলে দাও যত খিল!
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে,
মোদের মাথায় চন্দ্র সূর্য তারারা পড়ুক ঝ'রে
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি,
এক মোহানায় দাঁড়াইয়া শুন এক মিলনের বাঁশী।
একজনে দিলে ব্যথা
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা!
একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা— সকলের অপমান!

মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
ঊর্ধ্বে হাসিতেছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান!

পাঠবোধ :

প্রদীপের নীচেই জমাট বাঁধে অন্ধকার। মানুষের সভ্যতায় যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্য সহজলভ্য হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের বিনিময়ে, অথচ সেই স্বাচ্ছন্দ্যের কণামাত্রও তাঁরা ভোগ করতে পারেন না। হাতুড়ি, শাবল, গাঁইতি চালিয়ে যাঁরা সড়কপথ নির্মাণ করেন, তাঁরা কখনো দ্রুতগামী মোটরের আরোহী হন না। যাঁরা অট্টালিকা বানান ঘাম ঝরিয়ে, তাঁদের নিবাস ঝুপড়িতে। এই বৈষম্য কবিকে পীড়িত করেছে। শুধু পীড়া অনুভবই নয়, লেখক এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি মনে করেন, একদিন এই পৃথিবীর কর্তৃত্বের দায়িত্ব তুলে নেবেন শ্রমজীবী মানুষেরা। মহা-মানবের মহা-বেদনার মহা-উত্থান কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির এই বিশ্বাস আমাদের আশার আলোর পথ দেখায়।

শব্দার্থ :

বাবুসা'ব : বাবুসাহেব। বাবু শব্দের আভিধানিক অর্থ শৌখিন অথবা বিলাসী ব্যক্তি। সঙ্গে সাহেব যুক্ত হয়ে এখানে ধনী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
দধীচি : জনৈক মুনির নাম। বৃত্রাসুর যখন দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেন তখন দেবতারা জানতে পারেন যে দধীচি মুনির অস্থি দিয়ে নির্মিত অস্ত্রেই একমাত্র বৃত্রাসুরকে নিধন করা সম্ভব। একথা জানতে পেরে দধীচি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর অস্থি দিয়ে নির্মিত বজ্রাস্ত্রে বৃত্রাসুরের বিনাশ হয়। দেবগণ পুনরায় স্বর্গে অধিষ্ঠিত হন।
বাষ্প-শকট : শকট শব্দের অর্থ গাড়ি। বাষ্প দ্বারা চালিত গাড়ি অর্থাৎ রেলগাড়ির কথা বলা হয়েছে।
পাই : প্রাচীন মুদ্রাবিশেষ। এক পয়সার তিন ভাগের এক ভাগ।
মুটে : মোট অর্থাৎ ভার বহনকারী।
সিক্ত : ভেজা।

পদরজ : পায়ের ধুলো।
অঞ্জলি : আঁজলা, করপুট।
কবাট : দরজার পাল্লা। বানানভেদে কপাট।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)
ক) বাবুসা'ব কাদের রেল থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন?
খ) 'কুলি-মজুর' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
গ) শকট শব্দের অর্থ কী?
ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
ঙ) কবিতায় উল্লেখিত শ্রমজীবী মানুষের তিনটি জীবিকার উল্লেখ করো।
২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নে মূল্যাঙ্ক ২/৩)
ক) কবির মতে কাদের হাড় দিয়ে কোন যান চলে?
খ) পাহাড় ভাঙার জন্য কোন কোন হাতিয়ার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে?
গ) 'গাহি তাহাদেরি গান'। কবি কাদের জয়গান করেছেন এবং কেন?
ঘ) কবির মতে প্রভাত-সূর্য কোন রঙে রাঙা?
ঙ) মহা-মানবের উত্থানে কে হাসছেন আর কে কাঁপছে?
৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)
ক) 'কুলি-মজুর' কবিতায় কবি দধীচি মুনির সঙ্গে কাদের তুলনা করেছেন এবং কেন?
খ) নজরুলের সাম্যবাদী চেতনার আলোকে 'কুলি-মজুর' কবিতাটি বিশ্লেষণ করো।
গ) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো—

'তুমি শুয়ে রবে তেতালার 'পরে আমরা রহিব নীচে
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে।'

ঘ) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো—

'একের অসম্মান
নিখিল মানব জাতির লজ্জা— সকলের অপমান!'

পূব-পশ্চিম

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য

বাংলা কবিতার পটবদল শুরু হয় বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে প্রকাশিত 'কল্লোল', 'কালি ও কলম' ও 'প্রগতি' সাহিত্যপত্রকে কেন্দ্র করে। এই পত্রিকাগুলোর সঙ্গে জড়িত কবিরা প্রায় সকলেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং দেশ-বিদেশের নানা কাব্য-আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং চিন্তাজগতে যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, এই সময়ের কবিরা তা সাগ্রহে তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। এই কবিদের প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল আধুনিক কবিতার আন্দোলন। বাংলা আধুনিক কবিতার প্রথম পর্বের কবিদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অন্যতম। তাঁর কবিতার মানবজীবনের নানা ইতিবাচক দিক প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কবিতার সঙ্গে উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করে তোলার উদ্দেশ্যে 'পূব-পশ্চিম' কবিতাটি নির্বাচন করা হয়েছে। কবিতাটিতে বিভিন্ন ধরনের বিভেদের মধ্যেও তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের সুরটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

লেখক পরিচিতি :

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৯০৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নোয়াখালিতে (বর্তমান বাংলাদেশে) জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃ বিয়োগের পর মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে আসেন।

তিনি কলকাতার সাউথ সাব-আরবান কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজিতে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি আইনে স্নাতক হয়ে বিচার বিভাগের বিভিন্ন উচ্চপদে চাকরি করেন। চাকরি জীবনে তিনি ডিস্ট্রিক্ট জাজ এবং স্পেশাল জুডিশিয়াল অফিসার পদেও উন্নীত হন।

তিনি সাহিত্য জীবনে প্রথমে 'নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে লেখালিখি শুরু করে পরে স্বনামে সাহিত্য রচনা শুরু করেন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, জীবন-চরিত ইত্যাদি সাহিত্যের নানা শাখায় অবাধ বিচরণ করে তিনি এক শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'কল্লোল'-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কিছুকাল এই পত্রিকার সম্পাদনাও করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনাবলির মধ্যে বেদে (১৯২৮), আকস্মিক, কাক জ্যোৎস্না, বিবাহের চেয়ে বড়ো, ইন্দ্রাণী, প্রাচীর ও প্রান্তর, ঊর্ণনাভ, নবনীতা, যে যাই বলুক, আসমুদ্র, অন্তরঙ্গ, প্রথম কদম ফুল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। টুটা-ফুটা, ইতি, অকাল বসন্ত, অধিবাস, ডাব্‌ল ডেকার, পলায়ন, যতনবিবি, সারেঙ, হাড়ি মুচি ডোম, কাল রক্ত, কাঠ-খড়-কেরোসিন, চাষা-ভূষা ইত্যাদি ছোটোগল্প সংকলন ; অমাবস্যা, আমরা, প্রিয়া ও পৃথিবী, নীল আকাশ, আজন্ম সুরভি, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তরায়ন ইত্যাদি কবিতা সংকলন উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে 'কল্লোল যুগ' এবং 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' উল্লেখযোগ্য। তিনি জীবনী রচনায়ও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই শ্রেণির রচনার মধ্যে চারখণ্ডে রচিত 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ', 'পরম প্রকৃতি শ্রীসারদামণি', 'অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ', 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ', 'রত্নাকর গিরি', 'অমৃতপুরুষ যিশু', 'উদ্যত খড়্গ' নামে দুই খণ্ডে সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনী ইত্যাদি বিপুল জনপ্রিয়। তাঁর নাটকের মধ্যে মুক্তি, কেয়ার কাঁটা বিখ্যাত। অনুবাদ রচনার মধ্যে ন্যুট হ্যামসুনের অনুবাদ 'প্যান' আলফান্‌স দোদে ও সেলমা লেসারসফ-এর গল্প উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি লাভ করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার'।

১৯৭৬ সালের ১৯ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মূল পাঠ

তোমার শীতললক্ষ্যা আর আমার ময়ূরাক্ষী
তোমার ভৈরব আর আমার রূপনারায়ণ
তোমার কর্ণফুলি আর আমার শিলাবতী
তোমার পায়রা আর আমার পিয়ালী
এক জল এক ঢেউ এক ধারা
একই শীতল অতল অবগাহন, শুভদায়িনী শান্তি।
তোমার চোখের আকাশের রোদ আমার চোখের উঠোনে এসে পড়ে
তোমার ভাবনার বাতাস আমার ভাবনার বাগানে ফুল ফোটায়।

তোমার নারকেল সুপুরি অশোক শিমুল
আমার তাল খেজুর শাল মহুয়া
এক ছায়া এক মায়া একই মুকুল মঞ্জরী।
তোমার ভাটিয়াল আমার গম্ভীরা
তোমার সারি-জারি আমার বাউল
এক সুর এক টান একই অকূলের আকুতি
তোমার টাঙ্গাইল আমার ধনেখালি
তোমার জামদানি আমার বালুচর
এক সুতো এক ছন্দ একই লাবণ্যের টানা-পোড়েন
চলেছে একই রূপনগরের হাতছানিতে।

আমরা এক বৃন্তে দুই ফুল, এক মাঠে দুই ফসল
আমাদের খাঁচার ভিতরে একই অচিন পাখির আনাগোনা।
আমার দেবতার থানে তুমি বটের ঝুরিতে সুতো বাঁধো
আমি তোমার পীরের দরগায় চেরাগ জ্বালি।
আমার স্তোত্রপাঠ তোমাকে ডাকে
তোমার আজান আমাকে খুঁজে বেড়ায়।

আমাদের এক সুখ এক কান্না এক পিপাসা
ভূগোল ইতিহাসে আমরা এক
এক মন এক মানুষ এক মাটি এক মমতা
পরস্পর আমরা পর নই
আমরা পড়শী— আর পড়শীই তো আরশি
তুমি সুলতানা আমি অপূর্ব
আমি মহবুব তুমি শ্যামলী।

আমাদের শত্রুও সেই এক
যারা আমাদের আস্ত মস্ত সোনার দেশকে খণ্ড-খণ্ড করেছে
যারা আমাদের রাখতে চায় বিচ্ছিন্ন করে বিরূপ করে বিমুখ করে।
কিন্তু নদীর দুর্বার জলকে কে বাঁধবে
কে রুখবে বাতাসের অবাধ স্রোত
কে মুছে দেবে আমাদের মুখের ভাষা আমাদের রক্তের কবিতা
আমাদের হৃদয়ের গভীর গুঞ্জন?
তুমি আমাদের ভাষা বলো আমি আনন্দকে দেখি
আমি তোমার ভাষা বলি তুমি আশ্চর্যকে দেখ
এই ভাষায় আমাদের আনন্দে-আশ্চর্যে সাক্ষাৎকার।
কার সাধ্য অমৃতদীপিত সূর্য-চন্দ্রকে কেড়ে নেবে আকাশ থেকে?

আমাদের এক রবীন্দ্রনাথ এক নজরুল।
আমরা ভাষায় এক ভালোবাসায় এক মানবতায় এক
বিনা সুতোয় রাখীবন্ধনের কারিগর
আমরাই একে অন্যের হৃদয়ের অনুবাদ
মর্মের মধুকর, মঙ্গলের দূত
আমরাই চিরন্তন কুশলসাধক।।

পাঠবোধ :

অখণ্ড বঙ্গভূমিতে আবহমান থেকে একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসৃত। শতকের পর শতক ধরে এই অঞ্চলে বসবাসকারীদের ভাষাভিত্তিক পরিচয়েই গড়ে উঠেছিল বাঙালির জাতীয় সত্তা। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দশকে দেশের ব্রিটিশ প্রশাসন শাসনের সুবিধার জন্য পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ নামে অখণ্ড বঙ্গভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করে। এর পেছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত কার্যকরী ছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি জাতির ঐক্য ধ্বংস করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। পূর্ববঙ্গ ছিল মুসলমান প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু অধ্যুষিত। ইংরাজ শাসকের এই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দুই বাংলারই জনগণ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার পর সমগ্র রাজ্য জুড়ে বঙ্গভঙ্গ নিবারণ আন্দোলনের ব্যাপকতায় ইংরাজ প্রশাসন পরবর্তীকালে এই বিভাজন প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু তখন থেকে এক স্বার্থান্বেষী মহল পূর্ব পশ্চিম বাংলার জনগণের মনে ধর্ম, কথ্যভাষা, স্থানীয় সংস্কৃতি ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভেদ বীজ সযত্নে প্রতিপালন করতে থাকে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময় ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের মাধ্যমে পুনরায় বঙ্গের বিভাজন করা হয়।

কবি এই কবিতায় পূর্ব পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে যে বাঙালি সংস্কৃতি এবং বাঙালি ঐতিহ্য বর্তমান, সেই ঐতিহ্যেরই জয়গান করে দুই বাংলার সম্প্রীতি প্রসারিত করতে চেয়েছেন। উভয় বঙ্গভূমিই নদীমাতৃক, উভয় বঙ্গেই লোকসংগীতের মর্মস্পর্শী সুর বেজে চলছে বিভিন্ন নামে। হস্ততাঁত দুই বাংলার বস্ত্রশিল্পকে পৃথিবীর দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ধর্ম-চেতনাতেও বাঙালি সমন্বয়কামী। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যই হল এই দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের প্রধান শত্রু হল বিভেদকামী শক্তি। এই শক্তিই দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে। এর বিরুদ্ধে সজাগ হয়ে এর অগ্রগতি রোধ করতে হবে। সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের বাণী প্রতি হৃদয়ে পৌঁছে দিতে হবে এবং সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণকে, কবি-শিল্পীকে, কারণ তাঁরাই সমাজের এবং দেশের প্রকৃত কুশল সাধক।

শব্দার্থ ও টীকা

শীতললক্ষ্যা : লক্ষ্যা নামেও পরিচিত এই নদী বাংলাদেশে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র থেকে নির্গত এক নদী। নারায়ণগঞ্জ এই নদীর তীরে অবস্থিত।

ময়ূরাক্ষী : ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের নিকটবর্তী ত্রিকূট পাহাড় থেকে নির্গত এই নদী ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবাহিত। এই নদী 'মোর' নদী নামেও পরিচিত।

ভৈরব : ভৈরব নদী বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী টেঙ্গামারি থেকে (জলাঙ্গী নদী থেকে) উৎপন্ন হয়ে যশোর শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীর তীরেই খুলনা শহর গড়ে উঠেছে। এই নদীর একটি শাখা খুলনা-ইছামতী ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত গঠন করেছে।

রূপনারায়ণ : পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার ছোটনাগপুর অঞ্চলের ঢালেশ্বরী বা ঢালকিশোর থেকে উৎপন্ন এই নদী পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় প্রবাহিত। এই নদী ঘাটালের কাছে শিলাবতী নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাঁকুড়াতে এই নদী দ্বারকেশ্বর নদী নামেও পরিচিত।

কর্ণফুলি : বাংলাদেশের চট্টগ্রামে প্রবাহিত নদী। এই নদী ভারতের মিজোরামের লুসাই পর্বত থেকে নির্গত।

শিলাবতী : পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার ছোটনাগপুর পার্বত্যভূমি থেকে উৎপন্ন এই নদী 'শিলাই' নামেও পরিচিত। এই নদী পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায়ও প্রবাহিত।

পিয়ালী : পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের এক নদী। এক ধরনের গাছ।

ভাটিয়ালি : ভাটার টানে নৌকা ছেড়ে দিয়ে নদীবহুল বাংলাদেশের মাঝিরা যে সুরে গান গায়। বাংলার লোকসংগীত ও তার সুর।

গম্ভীরা : পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত গাজন উৎসব ও উৎসবে লোকসংগীত ও লোকনাট্য। এই পরম্পরা শিবের 'গম্ভীর' নাম থেকে জাত।

সারি-জারি : 'সারি' হল পূর্ববঙ্গের মাঝিদের গান বিশেষ, পূর্ববঙ্গের লোকসংগীত বিশেষ। এবং 'জারিগান' হল কারবালার ঘটনাবলি নিয়ে বাংলার গ্রামাঞ্চলের শোকগাথা জাতীয় গান।

বাউল : বাংলার সহজিয়া সাধকদের সাধনসংগীত বিশেষ। জাত-পাত নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই বাউল সাধনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

টাঙ্গাইল : বর্তমান বাংলাদেশের টাঙ্গাইল অঞ্চলের এক ধরনের ফুল তোলা বা নক্‌শা কাটা সুতি বা পশমের তাঁতের শাড়ি।

ধনেখালি : পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চুঁচুড়া মহকুমার ধনিয়াখালি অঞ্চলের বিখ্যাত সুতির তাঁতের শাড়ি।

জামদানি : তাঁতে বোনা ফুল ও নক্‌শা তোলা এক ধরনের শাড়ি। ঢাকা অঞ্চলের এই জাতীয় শাড়ি 'ঢাকাই জামদানি' নামে বিখ্যাত।

বালুচর : বালুচর গ্রামে তৈরি এক ধরনের তাঁতের শাড়ি।

পীরের দরগা : 'পির' বা মুসলমান সাধু মহাত্মার সমাধিস্থান।

চেরাগ : বাতি, প্রদীপ।

স্তোত্র পাঠ : স্তব, স্তুতি। মন্ত্র পাঠ। প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ।

আজান : নমাজ পড়ার জন্য মসজিদ থেকে উচ্চরবে আহ্বান বা আহ্বান-মন্ত্র পাঠ।

পড়শী : প্রতিবেশী, একই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজন।

আরশি : আয়না, দর্পণ।

গুঞ্জন : অস্পষ্ট মধুর মৃদুধ্বনি, গুনগুন রব (কবিতায়)।

অমৃতদীপিত : অমৃতদীপ্ত, অমরত্বে উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত।

রাখীবন্ধন : রাখি পূর্ণিমায় ভাই বা দাদার মণিবন্ধে বোনের মঙ্গল কামনার প্রতীক। রক্ষাবন্ধন সূত্র বাঁধার উৎসব। পরস্পরের সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রচনার মঙ্গল-অনুষ্ঠান।

কারিগর : শিল্পী, নির্মাতা।

মধুকর : মৌমাছি, ভ্রমর।

কুশলসাধক : মঙ্গলসাধক, কল্যাণ ব্রতে আত্মনিয়োগকারী।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রথমে কোন ছদ্মনামে কবিতা লেখা শুরু

করেছিলেন?

খ) 'রূপনারায়ণ' নদী কোন রাজ্যে প্রবাহিত?

গ) 'পিয়ালী' শব্দের অর্থ কী?

ঘ) 'গম্ভীরা' বাংলার কোন অঞ্চলে প্রচলিত?

ঙ) 'তোমার টাঙ্গাইল আমার ধনেখালি'— এখানে 'টাঙ্গাইল' শব্দে কী সূচিত করা হয়েছে?

চ) 'আমি তোমার পীরের দরগায় —— জ্বালি'। (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)

ছ) 'কে মুছে দেবে আমাদের মুখের ভাষা আমাদের রক্তের ——' (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)

জ) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কোন পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন?

ঝ) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের যে কোনো একটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

ঞ) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) 'পূব-পশ্চিম' কবিতাটিতে 'পূব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 'পশ্চিম' শব্দের তাৎপর্য কী?

খ) 'আমাদের খাঁচার ভিতরে একটা অচিন পাখির আনাগোনা'— এখানে 'খাঁচা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 'অচিন পাখি'টি কী?

গ) 'পূব-পশ্চিম' কবিতাটিতে উল্লিখিত যে কোনো চারটি নদীর নাম লেখো।

ঘ) 'পূব-পশ্চিম' কবিতাটিতে উল্লিখিত যে কোনো চারটি লোকসংগীতের নাম লেখো।

ঙ) 'পূব-পশ্চিম' কবিতাটিতে উল্লেখিত যে কোনো চারপ্রকার শাড়ির নাম লেখো।

চ) 'পূব-পশ্চিম' কবিতার পূর্ব ও পশ্চিমের অভিন্নতাসূচক যে কোনো তিনটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করো।

ছ) 'পূব-পশ্চিম' কবিতায় পূর্ব ও পশ্চিমের অভিন্ন শত্রু কে? সে কী করেছে? সে কী করতে চায়?

জ) পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ভাষাগত ব্যবধানকে কবি কীভাবে উপস্থাপিত করেছেন?

৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) 'পূব-পশ্চিম' কবিতায় পূর্ব ও পশ্চিমের অভিন্নতাসূচক যে প্রসঙ্গগুলো কবি উত্থাপন করেছেন, তা একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

খ) 'পূব-পশ্চিম' কবিতায় বিভেদ অতিক্রম করে মিলনের যে বাণী প্রকাশ করা হয়েছে, তা নিজের মতো করে ব্যক্ত করো।

গ) ব্যাখ্যা করো—

(i) তোমার চোখের আকাশের রোদ আমার চোখের উঠোনে এসে পড়ে
তোমার ভাবনার বাতাস আমার ভাবনার বাগানে ফুল ফোটায়।

(ii) তোমার টাঙ্গাইল আমার ধনেখালি
তোমার জামদানি মার বালুচর
এক সুতো এক ছন্দ একই লাবণ্যের টানা-পোড়েন
চলেছে একই রূপনগরের হাতছানিতে।

(iii) আমরা এক বৃন্তে দুই ফুল, এক মাঠে দুই ফসল
আমাদের খাঁচার ভিতর অচিন পাখির আনাগোনা।

(iv) আমার দেবতার থানে তুমি বটের ঝুরিতে সুতো বাঁধো
আমি তোমার পীরের দরগার চেরাগ জ্বালি।

ঙ) তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো—

i) পরস্পর আমরা পর নই
আমরা পড়শী— আর পড়শীই তো আরশি

ii) আমরাই একে অন্যের হৃদয়ের অনুবাদ
মর্মের মধুকর, মঙ্গলের দূত
আমরাই চিরন্তন কুশল সাধক।

কবি কাদের 'চিরন্তন কুশল সাধক' বলেছেন? কেন? বিস্তারিত আলোচনা করো।

চ) 'পূব-পশ্চিম' কবিতাটিতে এক প্রবল আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে। নানা ধরনের বিভেদ ও বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আশাবাদের স্বরূপ ব্যক্ত করো।

ছ) 'পূব-পশ্চিম' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

খরা

শঙ্খ ঘোষ

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য

সাম্প্রতিক কালের কবিদের মধ্যে শঙ্খ ঘোষ একজন অগ্রগণ্য কবি। বর্তমান সভ্যতার নানা সমস্যা তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য কবিতাটি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

কবি পরিচিতি

শঙ্খ ঘোষের জন্ম ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ (২২ মাঘ ১৩৩৮) ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে মামার বাড়িতে। মা শ্রীমতী অমলাবালা ঘোষ এবং পিতা শ্রী মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। আদি নিবাস বরিশাল জেলার বানারিপাড়াতে। পাবনা জেলায় পাক্‌শির 'চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ' থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর কলকাতার প্রেসিডেন্সি থেকে আই.এ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করেন। অধ্যাপনার জীবনও দীর্ঘ। তিনি ক্রমান্বয়ে বঙ্গবাসী কলেজ, জঙ্গিপুর কলেজ, বহরমপুর গার্লস কলেজ, সিটি কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষও ছিলেন। এ ছাড়া স্বদেশে-বিদেশে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবেও কাজ করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি'। তারপর থেকে প্রকাশিত হয়েছে বহু কবিতার বই ও প্রবন্ধগ্রন্থ। প্রবন্ধগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'শব্দ আর সত্য', 'নিঃশব্দের তর্জনী', 'নির্মাণ আর সৃষ্টি', 'উর্বশীর হাসি', 'ঐতিহ্যের বিস্তার', 'ছন্দের বারান্দা' ইত্যাদি।

লাভ করেছেন অসংখ্য পুরস্কার, তার মধ্যে কিছু— নক্ষত্র পুরস্কার, নরসিংহ

দাস পুরস্কার ('মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' কাব্যগ্রন্থের জন্য), রবীন্দ্র পুরস্কার, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি, দেশিকোত্তম ইত্যাদি। ২০১৬ সালে তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কারেও সম্মানিত হন। পাঠ্য কবিতাটি 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

মূল পাঠ

সব নদী নালা পুকুর শুকিয়ে গিয়েছে
জল ভরতে এসেছিল যারা
তারা
পাতাহারা গাছ
সামনে ঝলমল করছে বালি।

এইখানে শেষ নয়, এই সবে শুরু।
তারপর
বালি তুলে বালি তুলে বালি তুলে বালি
বালি তুলে বালি

বিশ্বংসার এ-রকম খালি
আর কখনো মনে হয়নি আগে।

পাঠবোধ

বর্তমানের ক্লেদাক্ত সভ্যতায় শুভরাষ্ট্র কোথাও নেই। স্ফীত জনসংখ্যার দেশে আশ্চর্যজনকভাবে মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। যা কিছু মানবিক বোধের পরিচায়ক

সে গুণগুলি আয়ত্ত করতে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে পারেন।

শব্দার্থ

খরা : অনাবৃষ্টি, দীর্ঘকাল বৃষ্টি না হলে যে অবস্থা হয়।

বিশ্বসংসার : জগৎ সংসার, সমগ্র জগৎ।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) খরা কবিতাটির কবি কে?

খ) এটি তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) খরার ফলে কী হয়েছে?

খ) "এইখানে শেষ নয়, এই সবে শুরু"— তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) "বালি তুলে বালি তুলে বালি তুলে বালি
বালি তুলে বালি"— সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

খ) 'খরা' কবিতাটির মর্মার্থ বিশ্লেষণ করো।

ফুলের বিবাহ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান পরিচয় ঔপন্যাসিক হিসাবে। সফল ঔপন্যাসিক হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন সার্থক প্রাবন্ধিক এবং নিবন্ধকারও ছিলেন। রস রচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর নিবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ। আপাত হাস্যরসের আড়ালে সমকালের সামাজিক ব্যাধিকে চিহ্নিত করার এ এক অনন্য আয়োজন। 'ফুলের বিবাহ' শীর্ষক পাঠটি 'কমলাকান্তের দপ্তর' থেকে সংকলিত। মহান স্রষ্টার সমাজমনস্কতা, কল্পনাশক্তি, প্রচ্ছন্ন কবিমন ও সরস উপস্থাপন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে পাঠটি নির্বাচন করা হল।

লেখক পরিচিতি :

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬.৬.১৮৩৮—৮.৪.১৮৯৪)

চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক, 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের উদ্‌গাতা এবং বাংলার 'নবজাগরণ যুগের' অন্যতম প্রধান পুরুষ। বিদ্যাশিক্ষা মেদিনীপুর, হুগলি কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আইন অধ্যয়ন শেষ হওয়ার আগেই সরকার তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত করেন। ৩৩ বছর সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্র-জীবনে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁর 'কামিনীর উক্তি' কবিতাটি পুরস্কৃত হয়। ইংরেজিতে রচিত কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস

'Rajmohan's Wife' (১৮৬৪)। প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৪টি। তার মধ্যে 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস ছাড়াও তিনি আরো কিছু লেখা লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'ললিতা', 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'বিবিধ সমালোচনা', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'কৃষ্ণচরিত্র' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। তাঁকে সাহিত্যসম্রাট ও ঋষি বঙ্কিম উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

মূল পাঠ

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম। ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি।

মল্লিকা ফুলের বিবাহ। বৈকাল-শৈশব অবসানপ্রায়, কলিকা-কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিল। কন্যার পিতা বড় লোক নহে, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভারগ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থল-পদ্ম নির্দ্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড় উঁচু, স্থলপদ্ম অত দূর নামিল না। জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যাকর্ত্তা পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার বার পাওয়া যায় না। এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মল্লিকা-বৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্ মেয়ে আছে?"

মল্লিকাবৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, "আছে!" ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্! গুণ্ গুণাগুণ্! মেয়ে দেখিব!"

বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া, মুদিতনয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্! গুণ দেখিতে চাই। ঘোম্‌টা খোল।"

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোম্‌টা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, "আমার মেয়েগুলি বড় লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।"

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এদিকে মল্লিকার সন্ধ্যাঠাকুরাণী-দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল— বলিল, "দিদি, একবার ঘোম্‌টা খোল— নইলে, বর আসিবে না— লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, সোণা আমার, ইত্যাদি।" কলিকা কত বার ঘাড় নাড়িল, কত বার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কত বার বলিল, "ঠান্‌দিদি, তুই যা!" কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল। তখন ঘটক মহাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌, গুণ্‌ গুণাগুণ! কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত?"

কন্যাকর্ত্তা বৃক্ষ বলিলেন, "ফর্দ্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব।" ভ্রমর বলিলেন, "গুণ্‌ গুণ্‌, আপনার অনেক গুণ্‌— ঘটকালীটা?"

কন্যাকর্ত্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, "তাও হবে।"

ভ্রমর— "বলি ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ— গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌!"

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, "আগে বরের কথা বল— বর কে?"

ভ্রমর— "বর অতি সুপাত্র।— তাঁর অনেক গুণ-ন-ন্‌।"

"কে তিনি?"

"গোলাবলাল গন্ধোপাধ্যায়। তাঁর অনেক— গুণ-ন—ন্‌।"

সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিমপ্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ পাইয়াই এ সকল শুনিতেছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাব বংশ বড় কুলীন ; কেন না, ইহারা "ফুলে" মেল। যদি বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক ; কেন না, ইহারা সাক্ষাৎ বাঞ্ছামালীর সন্তান ; তাহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল, এ ফুলে কাঁটা আছে, কোন্‌ কুলে বা কোন্‌ ফুলে নাই?

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া বোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বলিল, "আজি কালি ফুটিবে।"

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল ; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকাণা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল ; আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল। কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরযাত্র চলিল ; স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী— শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীদের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল— বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া, দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত ; সঙ্গে এক পাল পিপ্‌ড়া মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে ; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়— কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায় ? কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্ব্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি, বরপক্ষের বড় বিপদ্। বাতাস বাহকের বায়না লইয়াছিলেন ; তখন হুঁ— হুম্ করিয়া অনেক মর্‌দানি করিয়াছিলেন কিন্তু কাজের সময় কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম, বর বরযাত্র, সকলে অবাক্ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিই বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোম্‌টা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি ; গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে— রূপের ভরে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যূথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত ; নসী বাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত কসুমরূপিণী) কুসুমলতা সূচ সূতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন ; পুরোহিত মহাশয় দুই জনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসর-ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল, তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের রাঙ্গামুখে হাসি ধরে না। যূই, কন্যের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল রজনীগন্ধাকে বর তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল ; বকুল একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে ; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; আর ঝুম্‌কা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ি ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল। তখন—

"কমলকাকা— ওঠ বাড়ী যাই— রাত হয়েছে, ও কি, ঢুলে পড়্‌বে যে?"

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল; চমক হইলে দেখিলাম, কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল?— মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে— এই আছে, এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল,— সেই হাস্যমুখী শুভ্রস্মিতসুধাময়ী পুষ্পসুন্দরীসকল কোথায় গেল? যেখানে সব যাইবে, সেইখানে— স্মৃতির দর্পণতলে, ভূতসাগরগর্ভে। যেখানে রাজা প্রজা, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে— ধ্বংসপুরে! এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে— কেবল থাকিবে— কি? ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি? স্মৃতি?

কুসুম বলিল, "ওঠ না— কি কচ্চো?"

আমি বলিলাম, 'দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।"

কুসুম ঘেঁষে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে, কাকা?"

আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে?"

"ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের? আমি বলি কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।"

"কই?"

"এই যে মালা গাঁথিয়াছি।" দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে।

পাঠবোধ :

যথার্থ ব্যঙ্গ রচনার আড়ালে থাকে সমাজবোধ। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে হাস্যরসাত্মক নাটক ও প্রহসনে এই ধারাটি প্রকট। বাংলা লঘু রসাত্মক নিবন্ধ সাহিত্যের ধারাটিও ঈর্ষণীয়। একেবারে হালের বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটির সংক্ষেপিত তথা বিবর্তিত রূপটি রম্য রচনা হিসাবে স্বীকৃত। 'ফুলের বিবাহ' পাঠ করার পর এই রচনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটি আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। ফুলের বিয়ে উপলক্ষে একত্রিত ফুল ও কীট পতঙ্গের ছায়ার নীচে কার্যত লুকিয়ে রয়েছে বাঙালির বিবাহ অনুষ্ঠানে সমবেত বিভিন্ন চরিত্র এবং তাদের কার্যকলাপ। হালকা হাসির নীচে চোখের জল লুকিয়ে রাখার এক নিরাভরণ কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই রচনার বিস্ময়কর দিক হল অদ্ভুত দক্ষতায় বঙ্কিমচন্দ্র ফুলের জগতের উপমায় সম্পূর্ণ রচনাটি সাজিয়েছেন। এক নির্মল রস-উপভোগ এই রচনার অন্যতম প্রাপ্তি।

শব্দার্থ :

অবগুণ্ঠনবতী : ঘোমটা দেওয়া নারী।

ঠান্‌দিদি : ঠাকুমা অথবা ঠাকুমা সদৃশ বয়স্ক নারী।

ঘটকালী : যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী হয়ে বিয়ের যোগ্য পাত্রপাত্রীর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করেন তাঁকে ঘটক বলে। এই সম্বন্ধ স্থাপন প্রক্রিয়ার নাম ঘটকালি ('ঘটকালী' পুরনো বানান, বর্তমানে বর্জিত)। আবার ঘটকের কাজের বিনিময়ে

প্রাপ্য অর্থাদিকেও ঘটকালি বলা হয়। আলোচ্য পাঠে দুই ভিন্ন অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কড়ায় গণ্ডায় : কড়ি শব্দের অর্থ মুদ্রা। গণ্ডা গণনার একটি একক। কড়ায় গণ্ডায় শব্দের অর্থ বিস্তারিত হিসেব নিকেশ। বিশেষ করে প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে এই শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কুলীন : সদ্‌বংশীয়। বল্লাল সেন প্রবর্তিত নবগুণবিশিষ্ট কুলমর্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ।

উচ্চিঙ্গড়া : উইচিংড়ে। এক ধরনের পোকা। ইংরেজি প্রতিশব্দ Cricket। উচ্চিঙ্গট শব্দের বিবর্তিত রূপ।

রাতকাণা : যিনি রাতে দেখতে পান না।

খদ্যোত : জোনাকি।

নীতবর : নিতবর ('নীতবর' পুরনো বানান, বর্তমানে বর্জিত) অথবা উচ্চারণভেদে মিতবর শব্দের অর্থ বিয়ের সময় যে বালক সহচর হিসাবে বরের পাশে থাকে। ওই বালককে কোলবরও বলা হয়ে থাকে।

মোসায়েব : চাটুকার। খোশামুদে।

কুরুবক : ঝিণ্টি ফুল বা ঝাঁটি ফুলের গাছ।

কুটজ : গিরিমল্লিকা ফুলের গাছ।

পরিমল : সুগন্ধ। কুসুমসৌরভ।

অনিত্য : চিরস্থায়ী নয় এমন। নশ্বর।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) 'ফুলের বিবাহ' শীর্ষক পাঠটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?

খ) কোন ফুলের সঙ্গে কোন ফুলের বিবাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

গ) ফুলের বিবাহে ঘটকালি কে করেছিল?

ঘ) পাত্র গোলাবলালের পদবি কী ছিল?

ঙ) ফুলের বিবাহে কে নিতবর হয়েছিল?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) ফুলের বিবাহ কোন মাসের কত তারিখে সম্পন্ন হয়েছিল?

খ) ঘটক যখন গোলাপের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায় তখন গোলাপ কী করছিল?

গ) বিয়েতে মৌমাছিরা কীসের বায়না নিয়েছিল এবং কেন সে কাজ করতে পারেনি?

ঘ) বরযাত্রায় কার বাহক হওয়ার কথা ছিল এবং শেষ পর্যন্ত কে বাহকের ভূমিকা পালন করেন?

ঙ) নসীবাবুর কন্যার নাম কী? তার বয়স কত বলে উল্লেখিত হয়েছে?

চ) বরযাত্রায় পিঁপড়েদের ভূমিকা কেমন ছিল?

৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) গোলাপের সঙ্গে বিয়ে স্থির হওয়ার আগে মল্লিকার পিতা কোন কোন পাত্রের কথা বিবেচনা করেছিলেন এবং কেন সেগুলি কার্যকর হয়নি আলোচনা করো।

খ) ঘটক হিসাবে ভ্রমরের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে লেখো।

গ) ফুলের বিবাহে বরযাত্রার বিবরণ দাও।

ঘ) ফুলের বিবাহে বাসরঘরের যে ছবি চিত্রিত হয়েছে তা বিস্তৃত করো।

ঙ) ফুলের বিবাহে বর্ণিত আখ্যানের আড়ালে বাঙালির বিয়ের যে বাস্তবতা লুকিয়ে আছে তা পরিস্ফুট করো।

চ) ফুলের বিবাহ অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজমনস্কতার পরিচয় দাও।

স্বাদেশিকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল কবি-সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাই এক সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সাহিত্য রচনা যেমন করেছেন সমগ্র জীবন ধরে, ঠিক তেমনই দেশ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন সম্পূর্ণ ভালোবাসা দিয়ে। ভারতীয় আদর্শে আনন্দময় শিক্ষা বিস্তারের জন্য গঠন করেছেন 'বিশ্বভারতী', প্রত্যন্ত পল্লির সাধারণ মানুষদের জীবনের মান উন্নত করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন 'শ্রীনিকেতন'। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা আমরা জানি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে তিনি পথে নেমে এসেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানদের সম্প্রীতির জন্য পালন করেছিলেন 'রাখি উৎসব'। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ শাসকের 'নাইট' উপাধি অবহেলায় ত্যাগ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মনে স্বদেশ প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল বাল্যকালে। ঘরোয়া পরিবেশেই তিনি লাভ করেছিলেন স্বদেশ প্রেমের শিক্ষা এবং স্বদেশের স্বাধীনতা কর্মকাণ্ডে যোগদানের অনুপ্রেরণা। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি পরবর্তীকালে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁদের কৈশোরকালের স্বাদেশিকতার বিবরণ। তাঁর এই বিবরণে সেই যুগের স্বাদেশিকতার উন্মাদনা অত্যন্ত মনোগ্রাহীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিবরণ রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় উদ্ভাসিত করে তোলে। এই পাঠ উচ্চতর মাধ্যমিকের দ্বিতীয় বর্ষের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাদেশিকতার নামে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উন্মাদনার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করে তোলার প্রয়াস করা হল।

লেখক পরিচিতি :

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ মে, কলকাতার জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত ঠাকুর বাড়িতে। পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা দেবী। বাল্যকালেই তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি সাহিত্যের প্রতিটি শাখাকেই তিনি পত্রে-পুষ্পে বিকশিত করে তুলেছেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে লাভ করেছেন বিশ্ব সেরা নোবেল পুরস্কার। তিনি খুব উচ্চশ্রেণির চিত্রকরও ছিলেন। তাঁর ছবি সমগ্র বিশ্বে সমাদর লাভ করেছে। তাঁর বিখ্যাত রচনাবলির মধ্যে রয়েছে 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'পলাতকা', 'পূরবী', 'প্রান্তিক' প্রভৃতি কবিতা সংকলন ; 'বিসর্জন', 'রাজা', 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ইত্যাদি নাটক ; 'চোখের বালি', 'ঘরে-বাইরে', 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা', 'যোগাযোগ' ইত্যাদি উপন্যাস ; 'ছেলেবেলা', 'জীবনস্মৃতি', 'আত্মপরিচয়' ইত্যাদি আত্মজীবনী। 'গল্পগুচ্ছে'র চারটি খণ্ডে সংকলিত হয়েছে তাঁর প্রায় আশিটি ছোটগল্প।

ভারতীয় আদর্শে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামবাংলার উন্নতির জন্য 'শ্রীনিকেতন' গড়ে তোলেন। পল্লির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন এই শ্রীনিকেতনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট তিনি দেহত্যাগ করেন।

মূলপাঠ

বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত,

সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কর্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ লিখিয়াছি, লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে— তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। টাইম্‌স্ পত্রেও কোনো পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো বয়সে তিনি একদিন এ কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকতার সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল

না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি— ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও-বা সুবিধাকর কোথাও-বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে-অবস্থাতেই মানুষ থাক্‌-না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া, সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয়, তাহার সকলপ্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকলপ্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে— সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্মেন্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে বীরত্বের প্রহসনমাত্র অভিনয় করিতেছিল, তাহা কঠোর ট্র্যাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়ামের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ, তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়ে গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন— আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথী সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।

রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সব চেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুরমাত্রায় ছিল— আমরা হত-আহত পশু-পক্ষীর অতিতুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বউঠাকুরানী রাশীকৃত লুচি তরকারি প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ওই জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই, একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মানিকতলায় পোড়োবাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচনির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারিদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন।" মালী তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞা না, বাবু তো আসে নাই।" ব্রজবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, ডাব পাড়িয়া আন্।" সেদিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণনির্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্ণে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহারও উৎসাহের তুমুল হাতনাড়া তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠকে বহু দূরে ছাড়াইয়া গেল ; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড়বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জন, কেবল দুই ধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুঠ ছড়াইতেছে।

স্বদেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন, আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরাকাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে-তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারত সন্তানদের উৎসাহের নির্দশন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে— আমাদের এক বাক্সে যে-খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর

সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারো ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে।" বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য!— তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।

অবশেষে দুটি-একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে-ব্যক্তি ছোটো তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না— না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখতে পারে নাই। একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর-একদিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের

তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন— গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাঠবোধ :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি' থেকে সংগৃহীত এই 'স্বাদেশিকতা' পাঠটি কিশোর রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় তুলে ধরে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এক গুপ্ত সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে ইতিহাসবিদ এবং সমালোচকেরা মনে করেন। এই সভার নাম ছিল 'সঞ্জীবনী সভা' এবং সাংকেতিক ভাষায় একে বলা হত 'হামচুপামুহাফ'। এই সভার কার্যাবলি লেখার জন্য এবং অন্যান্য নানারকম কাজকর্মের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সাংকেতিক ভাষা উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর দেশপ্রেমের উন্মাদনা এবং দেশের জন্য কিছু একটা করার আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। কৈশোরকালেই তিনি স্বদেশে প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'স্বাদেশিকতা' অংশে তিনি যে গুপ্তসভার কথা বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর অন্যান্য জীবনীগ্রন্থেও

উল্লিখিত হয়েছে। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে এর পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর আত্মজীবনী 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে এই সঞ্জীবনী সভার উল্লেখ করেছেন।

শব্দার্থ :

স্বদেশাভিমান : স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা।
সর্বজনীন পরিচ্ছদ : সকলের পরিধানযোগ্য পোশাক।
হাস্যোচ্ছ্বাস : হাসির উচ্ছ্বাস।
পোড়ো বাড়ি : অব্যবহৃত বাড়ি, যে বাড়িতে অনেকদিন মানুষ বাস করেনি, পতিত বাড়ি।
অর্বাচীন : অল্প বয়স্ক।

টীকা :

হিন্দুমেলা : দেশে স্বদেশ চেতনা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে এবং গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ও উৎসাহে 'হিন্দুমেলা' আয়োজিত হয়। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন 'হিন্দুমেলা'র সম্পাদক এবং নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক। এই মেলাতে সর্বপ্রথম জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনী আয়োজিত হয়। দেশের উন্নতির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ই এই মেলার বিচার্য বিষয় ছিল।

নবগোপাল মিত্র : জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অতি ঘনিষ্ঠ নবগোপাল মিত্র 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি 'ন্যাশনাল পেপার'-এর পরিচালক ছিলেন। সেই যুগের অন্যতম জাতীয়তাবাদী এই নেতা দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'চৈত্রমেলা' বা 'হিন্দুমেলা'র অন্যতম আয়োজক ছিলেন।

মেজ দাদা : রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১.৬.১৮৪২ — ৯.১.১৯২৩)। প্রথম ভারতীয় আই.সি.এস। তিনি সাহিত্য এবং সংগীতের অনুরাগী ছিলেন। 'বোম্বাই চিত্র', 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', 'বৌদ্ধধর্ম' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত রচনা।

নবীন সেন : প্রকৃত নাম নবীনচন্দ্র সেন (১০.২.১৮৪৭ — ২৫.১.১৯০৯)। বাংলার বিশিষ্ট কবি। পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত রচনা।

জ্যোতি দাদা : রবীন্দ্রনাথের 'জ্যোতিদাদা'র সম্পূর্ণ নাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪.৫.১৮৪৯ — ৪.৩.১৯২৫)। তিনি রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী তিনি সাহিত্যচর্চা, অঙ্কন বিদ্যা এবং সংগীতে পারদর্শী ছিলেন।

রাজনারায়ণ বাবু : প্রকৃত নাম রাজনারায়ণ বসু (৭.৯.১৮২৬ — ১৮.৯.১৮৯৯)। স্বদেশপ্রেমী, বিদ্বান ও সাহিত্যিক। তিনি ব্রাহ্মধর্ম এবং বহু হিতকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'ব্রহ্মসাধন', 'ধর্মতত্ত্ব দীপিকা', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'সেকাল আর একাল' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত রচনা।

মানিকতলা : উত্তর কলকাতার একটি অঞ্চল।

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি দেশপ্রেমমূলক সংগীত। সাহিত্য সমালোচকেরা এই গানটিকে রবীন্দ্রনাথের গুপ্তসভা 'সঞ্জীবনী সভা'র অবদান বলে চিহ্নিত করেছেন।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) রবীন্দ্রনাথদের পরিবারের সকলের মধ্যে প্রবল দেশপ্রেম কার অনুপ্রেরণায় সঞ্চারিত হয়েছিল?

খ) আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল —— চর্চা করিয়া আসিয়াছিলেন। (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)

গ) রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেবকে কে ইংরাজিতে চিঠি লিখেছিলেন?

ঘ) 'হিন্দুমেলা'র অন্যতম কর্মকর্তা কে ছিলেন?

ঙ) 'মিলে সবে ভারতসন্তান' সংগীতটি কে রচনা করেছিলেন?

চ) রবীন্দ্রনাথদের স্বাদেশিকের সভার সভাপতি কে ছিলেন?

ছ) কার উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথদের স্বাদেশিকের সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

জ) স্বাদেশিক সভার সদস্যরা তাঁদের আয়ের কত অংশ সভায় দান করতেন?
ঝ) স্বদেশে —— প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)
ঞ) অবশেষে একদিন দেখি —— মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)
ট) "আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হয়েছে।"— উক্তিটি কার?
ঠ) রবীন্দ্রনাথদের স্বাদেশিক সভা কোথায় বসত?

২। খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটির মূল্যাঙ্ক ২/৩)
ক) কার উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথদের স্বাদেশিকের সভা গঠিত হয়েছিল? এই সভার সভাপতি কে ছিলেন?
খ) স্বাদেশিক সভার সদস্যরা তাঁদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করতেন কেন?
গ) রবীন্দ্রনাথদের স্বাদেশিক সভায় কোন কোন জিনিস উৎপাদন করা হয়েছিল?
ঘ) রবীন্দ্রনাথদের স্বাদেশিক সভা কীভাবে ভেঙে গিয়েছিল?
ঙ) রবীন্দ্রনাথদের স্বাদেশিক সভার অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
চ) রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কী পড়েছিলেন? শ্রোতাদের মধ্যে কোন বিখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন?
ছ) 'আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল'— এখানে কার কথা বলা হয়েছে? 'অর্বাচীন' শব্দের অর্থ কী?
জ) "এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন"— এখানে কার কথা বলা হয়েছে? 'মাটির মানুষ'-এর অর্থ কী?
ঝ) "দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুঙ্গব অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয় বিরল।' — রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।
ঞ) "সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের

তুমুল হাতনাড়া তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল ; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল"— এখানে কার কথা বলা হয়েছে? কোন প্রসঙ্গে করা হয়েছে?

৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির স্বদেশ প্রেমের একটি মূল্যায়ন প্রস্তুত করো।

খ) 'হিন্দুমেলা' সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

গ) 'হিন্দুমেলা'য় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অংশগ্রহণ সম্বন্ধে যা জানো আলোচনা করো।

ঘ) ভারতের 'সর্বজনীন পরিচ্ছদ' হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কী ধরনের পোশাক তৈরি করেছিলেন?

ঙ) স্বাদেশিক সভার দলবলের 'শিকার' পর্বের বর্ণনা দাও।

চ) শিকার থেকে ফেরার পথে এক বাগানে ঢুকে ব্রজবাবু কী করেছিলেন?

ছ) রবীন্দ্রনাথদের স্বাদেশিক সভার কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

জ) 'স্বাদেশিকতা' পর্বে রাজনারায়ণ বসু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পর্যালোচনার এক আলোচনা করো।

ঝ) ব্যাখ্যা করো :

দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি— ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না।

ঞ) গঙ্গার ধারে এক বাগানে ঝড়ের সময় স্বাদেশিক সভার সদস্যদের আচরণ ও রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

আমার জীবনস্মৃতি

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

(অংশবিশেষ)

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অসমিয়া সাহিত্যের প্রাণপুরুষ। তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচয় করানোর উদ্দেশে এই লেখাটি পাঠক্রমে সন্নিবিষ্ট করা হল। তদুপরি রচনাটির প্রথমাংশে উজান অসমের সৌন্দর্যের যে বর্ণনা রয়েছে সেটিও আকর্ষণীয়।

লেখক পরিচিতি

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৮৬৪-১৯৩৮) আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের কর্ণধার। পিতা দীননাথ বেজবরুয়া। কলকাতার জেনারেল অ্যাসেম্বলি'জ ইনস্টিটিউশন থেকে স্নাতক। ছাত্রাবস্থায়ই দুই সতীর্থ চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ও হেমচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে 'অসমিয়া ভাষার উন্নতি সাধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত 'জোনাকী' পত্রিকা (১৯৮৮-৮৯) প্রকাশ করেন। পরে কিছুদিন 'জোনাকী' সম্পাদনাও করেছেন। 'বাঁহী' (বাঁশি) পত্রিকাও সম্পাদনা (১৯১০-৩৫) করেছেন। 'অসম ছাত্র সম্মিলনে'র প্রথম অধিবেশন (গুয়াহাটি, ১৯১৬) তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অসম সাহিত্যসভার ত্রয়োদশ অধিবেশনে (শিবসাগর, ১৯৩১) তাঁকে 'রসরাজ' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছিল। তিনি অসমিয়া সাহিত্যে ছোটোগল্পের প্রবর্তক। 'সুরভি', 'সাধুকথার কুকি', 'জোনবিরি' তাঁর গল্প সংকলন। শিশুদের জন্য তিনি রচনা করেছেন 'বুঢ়ী

আইর সাধু', 'জুনুকা', 'ককাদেউতা আরু নাতি লরা'। 'কদমকলি' তাঁর কাব্যগ্রন্থ। 'পদুমকুওরী' তাঁর উপন্যাস। ঐতিহাসিক নাটক 'জয়মতী কুওরী', 'চক্রধ্বজ' এবং 'বেলিমার'। 'বারমতরা' ও 'হ-য-ব-র-ল' দুটি লঘু নাটক। প্রহসন জাতীয় রচনা, সেইসঙ্গে হাস্য-ব্যঙ্গ-কৌতুক রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অসমিয়া সাহিত্যে তিনি 'রসরাজ' ছাড়াও 'সাহিত্যরথী' এবং 'সাহিত্যসম্রাট' উপাধিতেও সুপরিচিত। পাঠ্য অংশটি 'মোর জীবন সোয়ঁরণ' গ্রন্থের আরতি ঠাকুরকৃত 'আমার জীবনস্মৃতি' থেকে নেওয়া হয়েছে।

মূল পাঠ

তখনকার কালে আসামের রাজধানী ছিল, রংপুর বা শিবসাগর। এই শিবসাগরের দৃশ্য রাজপ্রতিনিধিদিগের শহর গৌহাটির চেয়ে আলাদা। গৌহাটির অপরূপ রূপ মাধুর্য, লুইত নদীর মনোরম শোভা রিহা-মেখলার রূপে তার গায়ে বিরাজ করছে, তার গলায় পর্বতের সাতনরী হার, মাথায় ভুবনেশ্বরীর ধবল মুকুট, বুকের উপর উমানন্দ আর উর্বশী। শিবসাগর সমতল, দুচোখ ভরে যতখানি দেখা যায় তা পর্বতশূন্য নিরাভরণা ; মাত্র তার ক্ষীণ হাত দুখানি দিখৌ এবং দিচাং নামের ছোট নদীর বালা একজোড়া দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলেছে। গৌহাটি থেকে নৌকা করে আসতে ব্রহ্মপুত্রের কাছে বিদায় নিয়ে যখন দিখৌর বুকে ঢুকছি তখন আমার মনে যে ভাব হয়েছিল, নিম্ন আর মধ্য আসাম পার হয়ে রংপুর শহরে ঢুকতেও আমার সেরকমই মনোভাব জেগেছিল। নতুন জায়গায় আমাদের নিজেদের পুরানো বাড়ীতে যাচ্ছি এই আনন্দই আমাকে সারাটা পথ আপ্লুত করে রেখেছিল। কিন্তু যখন রংপুর পৌঁছলাম তখন একটা অনির্বচনীয় বীতরাগ আমার মনের সেই আনন্দকে শুকিয়ে দিল, কেন কে জানে।

আসাম দেশকে সারা ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোর সঙ্গে তুলনা করে কেউ কেউ ঠাট্টা করে মাছধরা জায়গা বলত। নিম্ন আসাম বা নামনি আসামের সঙ্গে উজনি অসম বা উচ্চ আসামের সেরকম তুলনা করে শিবসাগরকে ঠাট্টা করা হত। কিন্তু কিছুদিন বাদেই শিবসাগর সম্পর্কে আমার এমন বীতরাগ দূর হল এবং তার পরিবর্তে অনুরাগ জন্মাতে শুরু হল। তার কারণ হচ্ছে

বিশাল সুন্দর বরপুখুরী অর্থাৎ বড় পুকুর এবং তার পারে তিনটে দেউল। শঙ্করদেবের ভাষায় বলতে গেলে, এই দেউল তিনিটে— বিষ্ণুদেউল, দেবীদেউল আর মাঝখানে শিবদেউল :

সুবর্ণ রজত লোহা জ্বলে তিনি শৃঙ্গ।
চক্ষুত জমক লাগে দেখিতে বিরিঙ্গ।।

মন্দিরের দুটো দেউলে রজত শৃঙ্গের পরিবর্তে ত্রিশূল বিরাজ করছে, মাঝেরটায় অর্থাৎ শিবদেউলের মাথায় চকমকে শৃঙ্গ বিরাজ করছে। ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল ভরা এই পুকুরকে সরোবরের সম্মান দিয়ে শ্রীশঙ্করদেব বলেছেন :

তাহার মাঝে সরোবর এক।
সাগর-সঙ্কাশ দেখি প্রত্যেক।।
সুবর্ণময় পদ্মে আছে জুরি।
ভ্রমরে মধু পিয়ে তাত পরি।।
রাজহংস আদি যতেক পক্ষী।
পারি পার থাকে নাযায় উপেক্ষি।।

এই রকমের বড় পুকুরটা আশ্চর্যভাবে আমার মনে রেখাপাত করেছিল। তাছাড়া দিখৌ নদীর প্রবল স্রোত— আমার মনকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কোন সুদূরে। দিখৌ নদীর ওপারের রংঘর, কারেংঘর, তলাতলি ঘর, জয়সাগরের দেউল আর প্রকাণ্ড পুকুরগুলোও আমার মনকে যে ভরে দিয়েছিল সে কথা না বললেও চলে। খুব শীগগিরই শিবসাগর আমার কাছে আনন্দ সাগরে পরিণত হল আর রংপুর হল রঙের আলয়।

শিবসাগরের বাড়ীতে খেলার সাথী হল আমার দুজন ভাইপো। একজন আমার চেয়ে দেড় বছরের বড় আর অন্যজন আমার চেয়ে ছোট। প্রথম দিনই আমি আবিষ্কার করলাম যে ওরা আমার চেয়ে অনেক বেশী পড়েছে। অবশ্যি সে সবই বাংলা বই। ওদের বাংলা বিদ্যের 'তুবড়িবাজি'তে ওরা আমাকে অবাক করে দিত। পদ্যপাঠের বাংলা পদ্য আমার সামনে আবৃত্তি করে আমাকে যেন ওরা কোণঠাসা করে দিত। সেই কবিতার একটা আমার এখনও মনে আছে :

পর্ব্বতে ধূসর মেঘ হইল উদয়।
ভয়ঙ্কর শব্দ করি বেগে বায়ু বয়।।
পাতা উড়ে ফল পড়ে ভাঙ্গিতেছে ডাল।
উড়িল বাতাসে সব কুটিরের চাল।।
নদী জলে উঠে ঢেউ পর্বত সমান।
উপায় না পায় মাঝি করে হায় হায়।।

ওরা দুজনে যখন প্রচণ্ড শব্দ করে এই কবিতার কয়েক লাইন এমনভাবে আবৃত্তি করতে থাকে তখন ওদের কাছে আমার লখীমপুর এবং গৌহাটির বিদ্যার দৌড় এমন ভাবে ধরা পড়ে যায় যে আমার মন-নদীর শান্ত জলে পর্বতের সমান উঁচু ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে। আমার বিদ্যাহীনতা আমাকে ভীষণভাবে পীড়া দিতে থাকে। তখনই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, ওদের কাছ থেকে আমি বাংলা শিখে নিয়ে ওদেরই জব্দ করব রীতিমতো। যেমন সঙ্কল্প তেমন কাজ। ওদের কাছ থেকে বাংলা কবিতার বইখানা নিয়ে দুচারদিন পড়ে ওদের মুখস্ত করা কবিতাগুলো আমি মুখস্ত করে নিলাম। তারপর ওরা কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেই আমিও তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমানে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলে এই কবিতা যুদ্ধ বন্ধ হয়ে শান্তি স্থাপিত হল। ম্যালেরিয়া জ্বর কুইনিনের দ্বারা সাময়িক বন্ধ হলে পরে আবার তা প্রকাশ পাবার মতোই আমাদের এই কবিতার যুদ্ধ সাময়িক বন্ধ হলেও তা আবার অন্য আকারে প্রকাশ পেল। ঐ দুজন যোদ্ধা আবার নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে গেরিলা যুদ্ধ অর্থাৎ অনিয়মিতভাবে হয়রানি যুদ্ধে মেতে উঠল। আমরা শিবসাগরে যাওয়ায় কিছুদিন আগেই বরপেটার বিখ্যাত তিথিরাম বায়ন তাঁর বাংলা যাত্রা-গানের দল নিয়ে উজনি আসাম দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছিলেন। বায়নের সেই যাত্রাগানের অন্তর্গত রাধার 'মানভঞ্জনের পালা' থেকে এক একটা গানের বিকৃত সুরের টুকরোতে তারা আকাশ বাতাস মুখরিত করে দিল। সেই গানের এক এক টুকরো কথা আজকেও আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে,

ও রাই! আগে প্রেম করিলি হেসে হেসে।
এখন কান্দ কেন নির্জনে বসে।।

আমি ভাবলাম, একি হল। এইবার তো আমার রক্ষে নেই। কারণ তখন পর্যন্ত আমি কোন বাংলা যাত্রাগান দেখিনি বা শুনিনি, সেইজন্য এই দুজনের হাতে এবার আমার পরাজয় অনিবার্য। আমি যে সব অসমীয়া ভাওনা বা যাত্রা দেখেছি তার থেকে দু একটা পদ গেয়ে ওদের প্রত্যুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেগুলো ওরা যা তা বলে উড়িয়ে দিল, কোন আমলই দিলনা। তখনকার দিনে বাংলা গান, বাংলা ভাষা, বাঙালীর মত চুল কাটা, বা ধুতি চাদর পরাটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর যাত্রাগুলোতেও অসমীয়া অঙ্কীয়া ভাওনার পরিবর্তে বাঙালী যাত্রাগান দেখান হত। সত্রের মহন্তরা অশুদ্ধ বাংলা ভাষায় নাটক রচনা করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করত ও দর্শককে খুশি করত। মোটের উপর যা কিছু বাঙালী তা সবই ভাল— এই ধারণা সবার মনকে খুব প্রভাবান্বিত করেছিল। বড়রা যেদিকে যায়, ছোটরাও সেদিকে যায়, সেজন্য আমি ভাবলাম যে আমারও বাংলা জ্ঞানের অনভিজ্ঞতা অমার্জনীয়। আবার পরমুহূর্তে ভাবলাম, আমারই বা দোষ কি, আমিই বা কোথায় বাংলা যাত্রা দেখার বা শোনার সুযোগ পেলাম যে আমি এদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দেব, এই ভেবে আমি প্রতিদ্বন্দ্বী দুজনের কাছে হার মেনে চুপ করে গেলাম।

পাঠবোধ

অসমিয়া সাহিত্যের পথিকৃৎ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সরস রচনাশৈলীর সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচিত করার উদ্দেশে রচনাটি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হল। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করতে পারেন।

শব্দার্থ ও টীকা :

দিখৌ : নাগাপাহাড় থেকে প্রবাহিত হয়ে এই নদী ব্রহ্মপুত্রে এসে মিশেছে। অসমে মোটামুটি ২২৫ কি.মি. প্রবাহিত হয়েছে।

দিচাং (দিসাং) : অরুণাচলের পাটকাই পাহাড়ে এর উৎস। টিরাপ এবং নাগাল্যান্ডের মোন্ জেলা থেকে প্রবাহিত হয়ে ডিব্রুগড় ও শিবসাগরে এসে

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ দিকে মিশেছে। ঋতুবিশেষে নানা পরিযায়ী পাখিও এখানে এসে থাকে।

শঙ্করদেব : অসমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক এক মহাপুরুষ।

বীতরাগ : অশ্রদ্ধা, অনাসক্ত।

অনুরাগ : ভালোবাসা।

রজত : রূপো।

দেউল : দেবমন্দির।

ভাওনা : বিশেষ রকমের প্রাচীন অসমিয়া নাটকের অভিনয়। এই নাটকে বিভিন্ন ধরনের মুখোশ ব্যবহার করা হয়।

প্রহসন : নাটকের আকারে লেখা অত্যন্ত লঘু কল্পনাসিদ্ধ, অতিরঞ্জিত এক ধরনের হাস্যোচ্ছল নাটক।

১। প্রশ্নাবলি (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) 'মোর জীবন সোয়ঁরণ' গ্রন্থটির অনুবাদক কে?

খ) তখন অসমের রাজধানী কোথায় ছিল?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) শিবসাগরকে 'মাছধরা জায়গা' বলা হত কেন?

খ) শিবসাগরকে শেষ পর্যন্ত লেখকের পছন্দ হয়েছিল কেন?

গ) পাঠে উল্লিখিত তিনটি দেউল-এর নাম লেখো।

৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) 'আমার জীবনস্মৃতি' পাঠ্যাংশের শুরুতে গুয়াহাটির যে রূপ বর্ণিত হয়েছে তা তোমার নিজের ভাষায় লেখো।

খ) লেখকের অনুসরণে তাঁর বাল্যবয়সের 'কবিতা-যুদ্ধ'-এর বর্ণনা দাও।

গ) লেখকের অনুসরণে তৎকালীন যাত্রাগান সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রস্তুত করো।

মন্ত্রের সাধন

জগদীশচন্দ্র বসু

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য ঃ

জগদীশচন্দ্র বসু ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার অন্যতম পথিকৃৎ। পরাধীন দেশে অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও তিনি একের পর এক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষাতেও তিনি বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার অন্যতম প্রধান অগ্রদূত। এই পাঠকের মাধ্যমে তাঁর রচনার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা পরিচিত হতে পারবে। বিফলতাকে অতিক্রম করেও একান্ত প্রচেষ্টায় কীভাবে সাফল্য লাভ করা যায়, তা প্রাবন্ধিক এই রচনায় তুলে ধরেছেন। ছাত্রছাত্রীদের এই সদগুণে অনুপ্রাণিত করে তোলাও এই পাঠ নির্বাচনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

লেখক পরিচিতি :

আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বরে, বিক্রমপুরে (বর্তমান বাংলাদেশ)। তাঁর পিতার নাম ভগবানচন্দ্র বসু। তিনি পদার্থবিদ্যা এবং জীববিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যেরও তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাংলায় রচিত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ 'অব্যক্ত' নামে এক সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর চিঠিপত্রগুলো 'পত্রাবলী' নামে এক সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। দেশে বিজ্ঞান সাধনার জন্য তিনি 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বরে তাঁর মৃত্যু হয়।

মূল পাঠ

প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এই দ্বীপগুলি অতি ক্ষুদ্র প্রবাল-কীটের দেহ পঞ্জরে নির্মিত হইয়াছে। বহু সহস্র বৎসরে অগণ্য কীট নিজ নিজ দেহ দ্বারা এই দ্বীপগুলি নির্মাণ করিয়াছে।

আজকাল বিজ্ঞানের দ্বারা যে সব অসাধ্য সাধন হইতেছে, তাহাও বহু লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফলে। মানুষ পূর্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মনুষ্য বর্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা মনেও করিতে পারি না। কে প্রথমে আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, কে প্রথমে ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি যে, প্রথমে যাঁহারা কোনো নূতন প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহাদিগকে অনেক নির্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরেও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাতত মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে। কিন্তু কোনো চেষ্টা একেবারে বিফল হয় না। আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুইদিন পরে তাহা হইতেই মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবাল-দ্বীপ যেমন একটু একটু করিয়া আয়তনে বর্ধিত হয়, জ্ঞানরাজ্যও সেইরূপ তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে দুই একটি ঘটনা বলিতেছি।

একশত বৎসর পূর্বে ইটালি দেশে গ্যালভানি নামে একজন অধ্যাপক দেখিতে পাইলেন যে লোহা ও তামার তার দিয়া একটা মরা ব্যাংকে স্পর্শ করিলে ব্যাংটা নড়িয়া উঠে। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া এই ঘটনাটির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এরূপ সামান্য বিষয় লইয়া এত সময় অপব্যয় করিতে দেখিয়া, লোক তাঁহাকে উপহাস করিত। তাঁহার নাম হইল 'ব্যাং নাচানো' অধ্যাপক। বন্ধুরা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মরা ব্যাং যেন নড়িল, কিন্তু ইহাতে লাভ কি?'

কী লাভ? সেই যৎসামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিদ্যুতের বিবিধ গুণ সম্পর্কে নূতন নূতন আবিষ্কার হইতে আরম্ভ হইল। এই একশত বৎসরের

মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তির দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস যেন পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ দ্বারা পথ-ঘাট আলোকিত হইতেছে, গাড়ি চলিতেছে। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌঁছিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটি যেন আমাদের ঘরের কোণে আসিয়াছে— দূর আর দূর নাই। আমাদের স্বর বাড়ির এক দিক হইতে অন্য দিকে পৌঁছিত না। এখন বিদ্যুতের বলে সহস্র ক্রোশ দূরের বন্ধুর সহিত কথাবার্তা বলিতেছি। এমন-কী, এই শক্তির সাহায্যে দূর দেশে কী হইতেছে, তাহা পর্যন্ত দেখিতে পাইব। আমাদের দৃষ্টি ও আমাদের স্বর আর কোনো বাধা মানিবে না।

মনুষ্য এ পর্যন্ত পৃথিবী এবং সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু বহুদিন আকাশ জয় করিতে পারে নাই। ব্যোমযানে শূন্যে উঠা যায় বটে, কিন্তু বাতাসের প্রতিকূলে বেলুন চলিতে পারে না। আর এক অসুবিধা এই যে, বেলুন হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্যাস বাহির হইয়া যায়, এজন্য বেলুন অধিকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে না।

রেশমের আবরণ হইতে গ্যাস বাহির হইয়া যায় বলিয়া, বেলুন অধিকক্ষণ আকাশে থাকিতে পারে না। সোয়ার্জ নামে একজন জার্মান এই জন্য অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর এক বেলুন প্রস্তুত করেন। অ্যালুমিনিয়াম কাগজের ন্যায় হালকা, অথচ ইহা ভেদ করিয়া গ্যাস বাহির হইতে পারে না। বেলুন যে ধাতু-নির্মিত হইতে পারে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিল না। সোয়ার্জ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু বৎসর নিষ্ফল চেষ্টার পর অবশেষে বেলুন নির্মিত হইল। বেলুন যাহাতে ইচ্ছানুক্রমে বাতাসের প্রতিকূলে যাইতে পারে সেজন্য একটি ক্ষুদ্র এঞ্জিন প্রস্তুত করিলেন। জাহাজে জলের নীচে স্ক্রু থাকে, এঞ্জিনে স্ক্রু ঘুরাইলে জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে, সেইরূপ বাতাস কাটিয়া চলিবার জন্য একটি স্ক্রু নির্মাণ করিলেন। কিন্তু বেলুন নির্মিত হইবার অল্প পরেই সোয়ার্জের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। যাহার জন্য সমস্ত সম্পত্তি ও জীবন পণ করিয়াছিলেন তিনি তাহার পরীক্ষা করিতে পারিলেন না, এতদিনের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে চলিল।

সোয়ার্জের সহধর্মিণী তখন জার্মানি গবর্নমেন্টের নিকট বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিলেন। জার্মান গবর্নমেন্ট যুদ্ধে ব্যোমযান ব্যবহার

করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু সোয়ার্জের বেলুন যে কখনও আকাশে উঠিতে পারিবে কেহ তাহা বিশ্বাস করিত না। কেবল বিধবার দুঃখ কাহিনি শুনিয়া গবর্নমেন্ট দয়া করিয়া বেলুনটা পরীক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ বিভাগের কতিপয় অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। নির্দিষ্ট দিবসে বেলুন দেখিবার জন্য বহু লোক আসিল। পরীক্ষকেরা আসিয়া দেখিলেন, বেলুনটি অতি প্রকাণ্ড এবং ধাতুনির্মিত বলিয়া রেশমের বেলুন অপেক্ষা অনেক ভারী। অতঃপর বেলুন চালাইবার জন্য এঞ্জিন ও অনেক কল বেলুনে সংযুক্ত রহিয়াছে। এরূপ প্রকাণ্ড জিনিস কি কখনও আকাশে উঠিতে পারে! পরীক্ষকেরা একে অন্যের সঙ্গে বলাবলি করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত কল কোনোদিনও পৃথিবী ছাড়িয়া উঠিতে পারিবে না। লোকটি মরিয়া গিয়াছে, আর তাহার বিধবা অনেক আশা করিয়া দেখাইতে আসিয়াছে; সুতরাং অন্তত নামমাত্র পরীক্ষা করিতে হইবে। তবে বেলুনের সহিত অতগুলি কল ও জঞ্জাল রহিয়াছে, ওইগুলিকে কাটিয়া বেলুনটিকে একটু পাতলা করিলে হয়তো ২/৪ হাত উঠিতে পারিবে। হায়! তাহাদিগকে বুঝাইবার কেহ ছিল না; বেলুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, পৃথিবীতে তাঁহার স্বর আর শুনা যাইবে না। যে সব কল অনাবশ্যক বলিয়া কাটিয়ে ফেলা হইল তাহা আবিষ্কার করিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। ওই সব কল দ্বারা বেলুনটিকে ইচ্ছানুসারে দক্ষিণ, বামে ঊর্ধ্বে ও অধোদিকে চালিত করা যাইত।

ইহার পর আর এক বাধা পড়িল। সোয়ার্জের অবর্তমানে বেলুন কে চালাইবে? অপরে কী করিয়া কলের ব্যবহার বুঝিবে? সে যাহা হউক, দর্শকদিগের মধ্যে একজন এঞ্জিনিয়ার সাধ্যমত কল চালাইতে সম্মত হইলেন। অদূরে বিধবা কলের প্রত্যেক স্পন্দন গণিতেছিলেন। বেলুন পৃথিবী হইতে উঠিতে পারিবে কি? মৃত ব্যক্তির আশা ভরসা হয় এইবার পূর্ণ হইবে, নতুবা একেবারে নির্মূল হইবে। কল চালানো হইল, অমনি বেলুন পৃথিবী ছাড়িয়া মহাবেগে শূন্যে উঠিল। তখন বাতাস বহিতেছিল, কিন্তু প্রতিকূল বাতাস কাটিয়া বেলুন ছুটিল। এতদিনে সোয়ার্জের চেষ্টা সফল হইল। কিন্তু লোকেরা যেসব কল অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, স্বল্প কালের মধ্যেই তাহার আবশ্যকতা প্রমাণ হইল। বেলুন আকাশে উঠিল বটে, কিন্তু তাহা সামলাইবার

কল না থাকাতে অল্পক্ষণ পরেই ভূমিতে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু এই দুর্দশাতে সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সোয়ার্জ যে অভিপ্রায়ে বেলুন নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা কোনোদিন হয়তো সফল হইবে। দশ বৎসরের মধ্যেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। জেপেলিন যে ব্যোমযান নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা যুদ্ধে ভীষণ অস্ত্র হইয়াছিল। যুদ্ধের পর এই ব্যোমযান আটলান্টিক মহাসাগর অনায়াসে পার হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ইয়োরোপ ও আমেরিকার ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে।

ব্যোমযান গ্যাস ভরিয়া লঘু করিতে হয়, সুতরাং আকারে অতি বৃহৎ এবং নির্মাণ করা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। পাখিরা কী সহজেই উড়িয়া বেড়ায়! মানুষ কি কখনও পাখির মতো উড়িতে পারিবে? বড়ো বড়ো পাখিগুলি কেমন দুই-চারিবার পাখা নাড়িয়া শূন্যে উঠে, তাহার পর পাখা বিস্তার করিয়া চক্রাকারে আকাশে ঘুরিতে থাকে। ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে মিলিয়া যায়।

তোমাদের কি কখনও পাখির মতো উড়িবার ইচ্ছা হয় নাই? জার্মানি দেশে লিলিয়েনথাল মনে করিলেন, আমরা কেন পাখির মতো আকাশে ভ্রমণ করিতে পারিব না? তাহার পর পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জানিতেন, এই বিদ্যা সাধন করিতে অনেকদিন লাগিবে। শিশু যেরূপ একটু একটু করিয়া অনেক চেষ্টা হাঁটিতে শেখে, তাঁহাকেও সেইরূপ করিয়া উড়িতে শিখিতে হইবে। কিন্তু শিশু যেরূপ পড়িয়া গেলে আবার উঠিতে চেষ্টা করে, আকাশ হইতে পড়িয়া গেলে আর তো উঠিবার সাধ্য থাকিবে না, মৃত্যু নিশ্চয়। এত বিপদ জানিয়াও তিনি পরীক্ষা হইতে বিরত হইলেন না। অনেক পরীক্ষার পর নানাপ্রকার পাখা প্রস্তুত করিলেন এবং সেগুলি বাহুতে বাঁধিয়া পাহাড় হইতে ঝাঁপ দিয়া, পাখায় ভর করিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল যে, দুইখানা পাখার পরিবর্তে যদি অধিক সংখ্যক পাখা ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে হয়তো উড়িবার বেশি সুবিধা হইতে পারে। চেষ্টা করিয়া দেখিলেন তাহাই ঠিক।

ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত অতি সাবধানে তিনি এই সব পরীক্ষা করিতেছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া গিয়াছে, এজন্য তাঁহার কার্য শেষ করিতে তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। এখন যে কল প্রস্তুত করিলেন, তাড়াতাড়িতে

তাহা পূর্বের মতো দৃঢ় হইল না। তিনি সেই অসম্পূর্ণ কল লইয়াই উড়িতে চেষ্টা করিলেন। এবার অতি সহজেই বাতাস কাটিয়া যাইতেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা আসিয়া উপরের একখানা পাখা ভাঙিয়া দিল।

এই দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষা দ্বারা যে সব নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন তাহা পৃথিবীর সম্পত্তি হইয়া রহিল। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের সাহায্যে পরে উড়িবার কল নির্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে। মার্কিন দেশে অধ্যাপক ল্যাঙলি পাখাসংযুক্ত উড়িবার কল প্রস্তুত করিলেন ; তাহাতে অতি হালকা একখানা এঞ্জিন সংযুক্ত ছিল। পরীক্ষার দিন অনেক লোক দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কর্মকারের শৈথিল্যবশত একটি স্ক্রু ঢিলা হইয়া ছিল। এঞ্জিন চালাইবার পর কল আকাশে উঠিয়াই চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। এমন সময় ঢিলা স্ক্রুটি খুলিয়া গেল এবং কলটি নদীগর্ভে পতিত হইল। এই বিফলতার দুঃখে ল্যাঙলি ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা ভীরু তাঁহারাই বহু ব্যর্থ সাধনা ও মৃত্যুভয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। বীর পুরুষেরাই নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুভয়ের অতীত হইতে সমর্থ হন। ল্যাঙলির মৃত্যুর পর তাঁহারই স্বদেশী উইলবার রাইট উড়িবার-কল লইয়া পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। উড়িবার সময় একবার কল থামিয়া যায় এবং আকাশ হইতে পতিত হইয়া রাইটের একখানা পা ভাঙিয়া যায়। ইহাতেও ভীত না হইয়া পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং সেই চেষ্টার ফলে মানুষ গগনবিহারী হইয়া নীলাকাশে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পাঠবোধ :

মানব সভ্যতার উন্নতির প্রধান কারণ হিসেবে জগদীশচন্দ্র বসু বুদ্ধি, চেষ্টা এবং সহিষ্ণুতার কথা উল্লেখ করেছেন। এই তিনটি সদ্‌গুণের অধিকারী হলে মানুষ অসাধ্য সাধনও করতে পারে। মানব সভ্যতার আদি পর্ব থেকে এই তিনটি সদ্‌গুণের জন্যই মানুষ জল-স্থল-আকাশ জয় করতে সমর্থ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে যে প্রাথমিকভাবে বারবার

বিফলতা এসেছে, কিন্তু সেই বিফলতায় হতাশাগ্রস্ত না হয়ে, পূর্ণোদ্যমে যখন আবার চেষ্টা করা হয়েছে, তখনই সফলতা এসে ধরা দিয়েছে। বিজ্ঞানীর অসাধ্য সাধনের স্বপ্ন এভাবেই সফল হয়েছে। এই পাঠে প্রাবন্ধিক বিফলতার মধ্যেই যে সফলতার বীজ অন্তর্নিহিত হয়ে থাকে, তা প্রকাশ করার প্রয়াস করেছেন। বারবার পূর্ণোদ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে মন্ত্রের সাধন হবেই হবে।

শব্দার্থ ও টীকা :

দ্বীপ : চারদিকে জলবেষ্টিত স্থলভাগ।

পঞ্জর : খাঁচা, পাঁজরা বা বুকের হাড়ের খাঁচা। পাঠে প্রবাল কীটের দেহ-পঞ্জর বলতে প্রবাল কীটের দেহ দিয়ে নির্মিত অর্থকেই প্রকাশ করা হয়েছে।

অগণ্য : অসংখ্য, গণনার অতীত।

কীট : পোকা।

প্রবাল : সমুদ্রের কীট বিশেষ, পলা।

সহিষ্ণুতা : সহনশীলতা।

নির্যাতন : অত্যাচার, পীড়ন।

অনুসন্ধান : অন্বেষণ, খোঁজ।

অপব্যয় : বাজে খরচ, অপচয়, অন্যায়ভাবে নষ্ট করা।

সহস্র : হাজার।

ক্রোশ : পথের দূরত্বসূচক পরিমাণ, প্রায় ৮০০০ হাত দীর্ঘ। দুই মাইলের কিছু বেশি।

আধিপত্য : প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, প্রাধান্য, রাজত্ব।

এঞ্জিন : ইঞ্জিন শব্দের রূপভেদ, কল, চালক-যন্ত্রবিশেষ।

এঞ্জিনিয়ার : ইঞ্জিনিয়ার শব্দের রূপভেদ, যন্ত্রবিজ্ঞানী, যন্ত্রনির্মাতা, যন্ত্র-পরিচালক।

পরাঙ্মুখ : মুখ ফিরিয়ে নেয় যে, বিমুখ [সংস্কৃত পরাক (= বিপরীত দিক) + মুখ]।

কর্মকার : কামার, লৌহজীবী, যিনি লোহা ইত্যাদি ধাতুর সরঞ্জাম তৈরি

করেন।

শৈথিল্যবশত : অনবধানতা বা অমনোযোগের জন্য।

স্বদেশী : নিজের দেশের, নিজের দেশ-সম্বন্ধীয়।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) কোনো চেষ্টাই একেবারে —— হয় না। (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)

খ) প্রবাল-দ্বীপ যেমন একটু একটু করিয়া আয়তনে বর্ধিত হয়, —— ও সেইরূপ তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে। (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)

গ) গ্যালভানি কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?

ঘ) বিজ্ঞানী সোয়ার্জের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর তাঁর গবেষণার ফলাফল পরীক্ষার দায়িত্ব কে গ্রহণ করেছিলেন?

ঙ) বিজ্ঞানী সোয়ার্জের অবর্তমানে তাঁর বেলুন কল পরিচালনার দায়িত্ব কে গ্রহণ করেছিলেন?

চ) বিজ্ঞানী সোয়ার্জের পর কে ব্যোমযান নির্মাণে সাফল্য অর্জন করেছিলেন?

ছ) পাখাসংযুক্ত ওড়ার কল কে প্রস্তুত করেছিলেন?

জ) কার আবিষ্কৃত তত্ত্বের সাহায্যে পরবর্তীকালে ওড়ার কল নির্মাণ করা সম্ভবপর হয়েছিল?

ঝ) বিজ্ঞানী সোয়ার্জের ধাতুর বেলুন আবিষ্কারের পূর্বে কোন পদার্থ দিয়ে সে ধরনের বেলুন তৈরি করা হত?

ঞ) জগদীশচন্দ্র বসু রচিত যে কোনো একটি গ্রন্থের নাম বলো।

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) মানুষ কীসের বলে বর্তমান কালে পৃথিবীর রাজা হয়েছে?

খ) অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর বেলুন কে প্রস্তুত করেছিলেন? তিনি কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?

গ) জাহাজ কীভাবে জল কেটে অগ্রসর হয়?

ঘ) বিজ্ঞানী লিলিয়েনথাল কোন দেশের নাগরিক ছিলেন? তিনি কোন বিদ্যা

আয়ত্ত করতে উৎসাহী ছিলেন? তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল কী হয়েছিল?

ঙ) বিজ্ঞানী অধ্যাপক ল্যাঙলি কী প্রস্তুত করেছিলেন? তাঁর আকাশযান পরীক্ষার ফলাফল কী হয়েছিল?

চ) 'মন্ত্রের সাধন' পাঠটির রচয়িতা কে? কোন প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে এই পাঠটি সংগৃহীত হয়েছে?

৩। **দীর্ঘ প্রশ্ন** : (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) কার নাম 'ব্যাং-নাচানো' অধ্যাপক হয়েছিল? কেন?

খ) বিজ্ঞানী সোয়ার্জের ধাতুর বেলুনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে ব্যক্ত করো।

গ) বিজ্ঞানী লিলিয়েনথাল কী আবিষ্কার করতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন? তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনা দাও।

ঘ) মার্কিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ল্যাঙলি কী আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন? তাঁর গবেষণার ফলাফল কী হয়েছিল?

ঙ) উইলবার রাইটের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

চ) ব্যাখ্যা করো :

"যাঁহারা ভীরু তাঁহারাই বহু ব্যর্থ সাধনা ও মৃত্যুভয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। বীর পুরুষেরাই নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুভয়ের অতীত হইতে সমর্থ হন।"

ছ) 'মন্ত্রের সাধন' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করো।

জ) 'মন্ত্রের সাধন' প্রবন্ধের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

মাস্টার মহাশয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

মজাদার গল্প হিসেবে 'মাস্টার মহাশই' গল্পটি অনবদ্য। এর কৌতুকরস 'রামগরুড়ের ছানা'কেও হাসাতে অব্যর্থ। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সূক্ষ্ম কৌতুকরস সঞ্চারই এই গল্পটির একমাত্র উদ্দেশ্য।

জীবনী ঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (৩/২/১৮৭৩ — ৫/৪/১৯৩২)

আদি নিবাস গুরাপ-হুগলি। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে জামালপুর হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে পাটনা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বিলাত যান। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। ৮ বছর গয়ায় আইন ব্যাবসা করেছিলেন। ১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে কবিতা রচনা দিয়ে সাহিত্যজীবনে প্রবেশ করেন। গদ্যরচনায় হাত দেন পরে। শ্রীমতী রাধারানী দেবী ছদ্মনামে লিখে কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেন। 'প্রদীপ', 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখা উপন্যাস মোট ১৪টি। 'রত্নদীপ' উপন্যাসটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের স্বীকৃতি পেয়েছে। এটির নাট্য ও চিত্ররূপও খ্যাতি লাভ করেছে। ছোটগল্পের সংখ্যা শতাধিক। 'মর্মবাণী'তে প্রকাশিত পঞ্চাঙ্ক নাটকটি তিনি লিখেছিলেন শ্রীজানোয়ারচন্দ্র শর্মা নামে। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা— 'অভিশাপ' (ব্যঙ্গকাব্য), 'গল্পবীথি', 'সিন্দুর কৌটা', 'দেশী ও বিলাতী', 'সতীর পতি', 'রমাসুন্দরী' ইত্যাদি। সহজ, সরল, অনাবিল হাস্যরসের গল্প লেখক হিসেবে তিনি আজ স্মরণযোগ্য হয়ে আছেন।

মূল পাঠ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে বর্ধমান শহর হইতে ষোলো ক্রোশদূরে, দামোদর নদের অপর পারে, নন্দীপুর ও গোঁসাইগঞ্জ নামক পাশাপাশি দুইটি

বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল ; এবং উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর একটি প্রাচীন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। এখন সে গ্রাম দুখানিও নাই, বটবৃক্ষটিও অদৃশ্য। দামোদরের বন্যা সে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

ফাল্গুন মাস ; এক প্রহর বেলা হইয়াছে। গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর প্রজা এবং গ্রামের অভিভাবক স্থানীয় কায়স্থ সন্তান শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস দত্ত মহাশয় হুঁকা হাতে করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুয্যে ও কেনারাম মল্লিক (ইঁহারাও বড় প্রজা) নিকটে বসিয়া, এ বৎসর চৈত্রমাসে বারোয়ারি অন্নপূর্ণা পূজা কীরূপভাবে নির্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতে ছিলেন। পার্শ্ববর্তী নন্দীগ্রামেও প্রতি বৎসর চাঁদা করিয়া ধূমধামের সহিত অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে। এ বৎসর গুজব শুনা যাইতেছে, উহারা অন্যান্য বৎসরের মতো যাত্রা তো আনিবেই অধিকন্তু কলিকাতায় কোনো ঢপওয়ালিকেও বায়না দিয়া আসিয়াছে। ঢপ সংগীত এ অঞ্চলে ইতিপূর্বে কখনও শুনা যায় নাই। এ গুজব যদি সত্য হয়, তবে গোঁসাইগঞ্জেরও শুধু যাত্রা আনিলে চলিবে না, ঢপ আনিতে হইবে। উহারা কোন্ ঢপওয়ালিকে বায়না দিয়াছে, সেই গোপন সংবাদটুকু সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার নামটি 'সঠিক' জানিতে পারিলে, বর্ধমানে অথবা কলিকাতায় গিয়া খবর লইতে হইবে সেই ঢপওয়ালি অপেক্ষা কোন্ ঢপওয়ালি সমধিক খ্যাতিসম্পন্না, এবং সেই বিখ্যাত ঢপওয়ালিকে গাওনা করিবার বায়না দিতে হইবে— ইহাতে যত টাকা লাগে লাগুক। কারণ গোঁসাইগঞ্জবাসিগণের এক বাক্যে ইহাই মত যে, তিনপুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোনো বিষয়ে নন্দীপুরের নিকট হটে নাই— এবং আজিও হটিবে না।

আগামী বারোয়ারি পূজা সম্বন্ধে যখন গ্রামস্থ তিনজন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত প্রকার গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় রামচরণ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং হাতের লাঠিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া ধপাস করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হীরু দত্ত সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হে মোড়লের পো, অমন করে বসে পড়লে কেন? কী হয়েছে?"

রামচরণ দুইচক্ষু কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'কী হয়েছে

জিজ্ঞাসা করছেন দত্তজা, কী হতে আর বাকি আছে? হায় হায় হায়— কার্তিক মাসে যখন আমার জ্বর বিকার হয়েছিল, তখনই আমি গেলাম না কেন? এই দেখবার জন্যে কি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলি হা রে বিধেতা, তোর পোড়া কপাল!"

শ্যামাপদ ও কেনারামও ঘোর দুশ্চিন্তায় রামচরণের পানে চাহিয়া রহিলেন। দত্তজা বলিলেন, "কী হয়েছে, কী হয়েছে?" সব কথা খুলে বল। এখন আসছ কোথা থেকে?

দীর্ঘশ্বাসজড়িত স্বরে রামচরণ উত্তর করিল, "নন্দীপুর থেকে। হায় হায় শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁটে হয়ে গেল। হা রে কপাল?" বলিয়া রামচরণ সজোরে নিজ ললাটে করাঘাত করিল।

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কেন? নন্দীপুরওয়ালারা কী করেছে?"

"বলছি। বলবার জন্যেই এসেছি। এই রোদ্দুরে মশাই, এক ক্রোশ পথ ছুটতে ছুটতে এসেছি। গলাটা শুকিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। এক ঘটি জল—"

দত্তজার আদেশে অবিলম্বে এক ঘড়া জল ও একটি ঘট আসিল। রামচরণ উঠিয়া রোয়াকের প্রান্তে বসিয়া, সেই জলে হাত পা মুখ ধুইয়া ফেলিল ; কিঞ্চিৎ পানও করিল। তারপর হাত মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া, গভীর বিষাদে মাথাটি ঝুঁকাইয়া রাখিল।

হীরু দত্ত বলিলেন, "এবার বলো কি হয়েছে, আর দগ্ধে মেরো না বাপু।"

রামচরণ বলিল, "কী হয়েছে? যা হবার নয় তাই হয়েছে। বড় বড় শহরে যা হয় না, নন্দীপুরে তাই হয়েছে। এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও যা স্বপ্নে ভাবেনি, তাই হয়েছে। তারা হুস্কুল বসিয়েছে।"

তিনজনেই সমবেত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কী আবার? হুস্কুল কি?"

রামচরণ বলিল, "আরে ছাই, আমিই কি জানতাম আগে হুস্কুল কার নাম? আজ না শুনলাম ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালাকে হুস্কুল বলে।"

দত্তজা বললেন, "ওঃ— ইস্কুল খুলেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ— তাই খুলেছে। একজন ম্যাস্টর নিয়ে এসেছে। ইঞ্জিরি পাঠশালের গুরুমশয়াকে নাকি ম্যাস্টর বলে। দাশুঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে হুস্কুল

বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম ম্যাস্টর বসে দশবারোজন ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়াচ্ছে।"

হীরু দত্ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাস্টার কোথা হতে এসেচে তা কিছু শুনলে?"

"সব খবরই নিয়ে এসেছি। বর্ধমান থেকে এনেছে। বামুনের ছেলে— হারান চক্রবর্তী। পনেরো টাকা মাইনে, বাসা, খোরাক। সব খবরই নিয়ে এসেছি।"

বাহিরে এই সময় একটা কোলাহল শুনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, পিল পিল করিয়া লোক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে আসিতে আসিতে নন্দীপুরের হস্তে গোঁসাইগঞ্জের এই অভূতপূর্ব পরাভব সংবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। সকলে আসিয়া চিৎকার করিয়া নানাছন্দে বলিতে লাগিল, "এ কী সর্বনাশ হল! নন্দীপুরের হাতে এই অপমান? আমাদের ইস্কুল খোলবার এখন কী উপায় হবে?" হীরু দত্ত সেই রোয়াকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

"ভাই সকল! তোমরা কি মনে করেছ, তিনপুরুষ পরে আজ গোঁসাইগঞ্জ নন্দীপুরের কাছে হটে যাবে? কখনই না। এ দেহে প্রাণ থাকতে নয়। আমরাও ইস্কুল খুলব। ওরা বা কী ইস্কুল খুলেছে, আমরা চতুর্গুণ ভালো ইস্কুল খুলব। তোমরা শান্ত হয়ে ঘরে যাও। আজই খাওয়া দাওয়া করে আমি বেরুচ্ছি। কলকাতা যাবার রেল খুলেছে, আর তো কোনো ভাবনা নেই। আমি কলকাতায় গিয়ে ওদের চেয়ে ভালো মাস্টার নিয়ে আসব। ওরা ১৫ টাকা দিয়ে মাস্টার এনেছে? আমরা ২৫ টাকা মাইনে দেব। ওদের মাস্টারকে পড়াতে পারে এমন মাস্টার আমি নিয়ে আসব। আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে, আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাব বসাব বসাব— তিনসত্যি করলাম। এখন যাও তোমরা বাড়ি যাও, স্নানাহার করো গে।"

"জয় গোঁসাইগঞ্জের জয়। জয় হীরু দত্তের জয়!" সোল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে তখন সেই জনতা প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতা হইতে মাস্টার নিযুক্ত করিয়া হীরু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাস্টারমহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স ত্রিশ বৎসর, খর্বাকার, কৃশকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী। ইংরাজি বলিতে কহিতে লিখিতে নাকি ভারি ওস্তাদ। ইংরাজিটা তাঁর এতই বেশি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে ইংরাজি কথা মিশাইয়া ফেলেন— অজ্ঞ লোকের সুবিধার্থে আবার তাহা বাংলা করিয়া বুঝাইয়াও দেন। বলেন, পূর্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলিকাতার গঙ্গার ধারে মাস্টারমহাশয় না কি বেড়াইতে ছিলেন, তথায় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। সাহেব তাঁহার ইংরাজি শুনিয়া, লাট সাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিলেন। লাটসাহেব মাস্টারমহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া, ডেপুটি কালেক্টারি পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না, সেই প্রস্তাব তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫ টাকার চাকরি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। পুরুষস্য ভাগ্যং।— মাস্টারমহাশয়ের মুখে এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া এবং তাহার ইংরাজিয়ানা চালচলন দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

হীরু দত্তের প্রতিজ্ঞা অনুসারে পরদিনই ইস্কুল খুলিল। পনেরো ষোলোটি ছাত্র লইয়া মাস্টারমহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা হইতে (দত্তজার ব্যয়ে) তিনি প্রচুর পরিমাণে সেলেট, পেন্সিল ও মরে সাহেবের স্পেলিং-বুক পুস্তক খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন। ছাত্রগণের উৎসাহ বর্ধনার্থ সেগুলি তাহাদিগকে বিনামূল্যেই দেওয়া হইতে লাগিল।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের লোকের পথেঘাটে দেখা হইলে, উভয় গ্রামের মাস্টার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত— "বর্ধমানের মাস্টার, ও জানেই বা কী, আর পড়াবেই বা কী!" নন্দীপুর বলিত— "হলেই বা আমাদের মাস্টারের বর্ধমানে বাড়ি, তিনিও তো কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। ওঁরা যখন পড়তেন, তখন কি বর্ধমানে ইংরিজি ইস্কুল ছিল? কলকাতায় গিয়ে ইংরিজি পড়তে হত।"

যথাসময়ে উভয় গ্রামের বারোয়ারি পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামই উভয় গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ, যাত্রা ও ঢপসংগীত শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষে উভয় মাস্টারের সাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং সভাস্থলে প্রকাশ পাইল, উভয়ে পূর্বাবধি পরিচিত।

পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাস্টার নাকি বলিয়াছেন— "ওই বেজা বুঝি ওদের মাস্টার হয়েছে, তা অ্যাদ্দিন জানতাম না। ওটা তো মহামূর্খ! ছেলেবেলায় কলকাতায় আমরা এক ক্লাসে পড়তাম কিনা। আমরা যখন সেকেনবুক পড়ি, সেই সময়ে ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর আর তো ও ইংরেজি পড়েনি। বড় বাজারে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখত, মাইনে ছিল সাত টাকা। গেল বছরও তো কলকাতায় ওর সঙ্গে দেখা হয় ; তখন তো ওই চাকরি করছে।" গোঁসাইগঞ্জবাসিরা ব্রজ মাস্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি শুনছি?"

ব্রজ মাস্টার একথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "একেই বলে কলিকাল। সেকেনবুক পড়ার সময় আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম, না ওই ছেড়ে দিয়েছিল? হয়েছিল কী জান না বুঝি? মাস্টার কেলাসে রোজ পড়া জিজ্ঞাসা করত, ও একদিনও বলতে পারত না। মাস্টার একদিন ওকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে ও এন্‌সার করতে পারলে না। আমায় জিজ্ঞাসা করতেই আমি বললাম। মাস্টার আমায় বললে, দাও ওর কান মলে। আমি কান মলে দিতেই, ওর মুখচোখ রাগে লাল হয়ে গেল। ও বলতে লাগল, আমি হলাম বামুনের ছেলে, ও কায়েত হয়ে কিনা আমার কানে হাত দেয়। সেই অপমানে ও-ই তো ইস্কুল ছেড়ে দিলে। আমি তারপর পাঁচ-ছ-বছর সেই ইস্কুলে পড়ে, একেবারে লায়েক হয়ে তবে বেরুলাম।"

অতঃপর গোঁসাইগঞ্জের লোক, নন্দীপুর কর্তৃক ব্যক্ত ওই অপবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে হারান মাস্টার বলিল, "আমরা ইস্কুলে যে মাস্টারের কাছে পড়তাম তিনি আজও বেঁচে আছেন। গোঁসাইগঞ্জ থেকে তোমরা দুজন মাতব্বর লোক আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, কার কথা সত্যি আর কার কথা মিথ্যে।"

এইকথা শুনিয়া ব্রজ মাস্টার হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ! এই কথা বলেছে? ও সব বিলকুল ফল্‌সো— মিথ্যে কথা। সেই মাস্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে ভজিয়ে দেবে? তিনি কি আর বেঁচে আছেন? গেল বছরের আগের বছর, তিনি যে হেভেন— স্বর্গে গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি ইনভাইট— নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি। বেশ মনে আছে। আমাকে বড্ড ভালোবাসতেন যে। একেবারে সন্‌ইকোয়েল— পুত্রতুল্য। তাঁর ছেলেরাও আজও আমায় বোজে দাদা বলতে ইগ্নোরেন্ট— অজ্ঞান।"

উভয় মাস্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয় গ্রামই স্ব স্ব মাস্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোনো প্রকাশ্য স্থানে দুইজনের মধ্যে বিচার হউক, কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাউক।

উভয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে বটবৃক্ষ আছে তাহারই নিম্নে বিচারসভা বসিবে।

কিন্তু উভয় গ্রামের লোকই ইংরাজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যাহাতে জয় পরাজয় সম্বন্ধে কাহারও মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে এমন একটি সরল বিচার প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। উভয় গ্রামের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে মাস্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবে, অপরকে তার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন তবে উভয়ে তুল্যমূল্য। একজন অন্যকে ঠকাইতে পারিলে, তিনিই জয়পত্র পাইবেন।

বিচারের দিন স্থির হইল আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা ; স্থান— উপরিউক্ত বটবৃক্ষতল ; সময় সূর্যাস্ত। ধার্য দিনে সূর্যাস্তের পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজ মাস্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাকঢোল কাড়া-নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যকরগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটি বৃহৎ রামশিঙা লইয়া চলিয়াছে— ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাকঢোল পিটাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রাম ফিরিয়া আসিতে হইবে।

পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাস্টারের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিগত বলিতে লাগিলেন— "কী হে মাস্টার মুখ রাখতে পারবে তো? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু বের করে রাখ, হারান মাস্টার যেন কিছুতেই তার মানে না বলতে পারে।" ব্রজবাবু বলিলেন, "আপনারা ভাবছেন কেন, দেখুন না কী করি। এমন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব যে তা শুনেই হারান মাস্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে— মানে বলা তো দূরের কথা!" দত্তজা বলিলেন, "দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পারো তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব।" কেহ স্পষ্ট না বলিলেও ব্রজ মাস্টার ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে আজ যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে এ গ্রাম কল্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষতলে উপনীত হইল। শপ মাদুর সতরঞ্জি প্রভৃতি বাহকেরা তৎপূর্বেই আনিয়া, নিজ গ্রামের সীমারেখার উপর সেগুলি বিছাইয়া রাখিয়াছে। দূরে পঙ্গপালের মতো নন্দীপুরবাসিগণ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সঙ্গেও শপ মাদুর প্রভৃতি ও ঢাক ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে। ক্রমে নন্দীপুর আসিয়া নিজ সীমানার নিকট শপ, মাদুর বিছাইয়া বসিয়া গেল। উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগত সম্মুখে বসিয়াছেন, মধ্যে দুই তিন হাত মাত্র খালি জমি।

এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন্ মাস্টার প্রথমে মানে জ্ঞিাসা করিবেন। উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবি করিল। কোনো পক্ষই নিজ দাবি ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন। হীরু দত্ত মহাশয় একটি ছড়ি ঘুরাইয়া ঊর্ধ্বে ছুঁড়িয়া দিউন, সে ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে, সেই গ্রামের মাস্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন। 'আমার ছড়ি লউন— আমার ছড়ি লউন' বলিয়া উভয় গ্রামের অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাছে যে ছড়িটি পাইলেন, তাহা লইয়া হীরু দত্ত সজোরে ঘুরাইয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। ক্রমে ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে।

নন্দীপুর ইহা দেখিয়া সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল ; গোঁসাইগঞ্জের মুখটি চুন হইয়া গেল। সকলে সাগ্রহে বিচারফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

নন্দীপুরের হারান মাস্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; ব্রজ মাস্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; তাঁহার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল ; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না।

হারান মাস্টার তখন বলিলেন, 'আচ্ছা বলো দেখি, এর মানে কী—

Horns of a dilemma

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাস্টার এই কূট প্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "এর মানে— উভয়সংকট— কেমন কি না?"

"পেরেছে পেরেছে আমাদের মাস্টার পেরেছে"— বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন। এবার ব্রজ মাস্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"শোনো হারানবাবু, আমি তোমায় কোনো কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে ; বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব। এ অঞ্চলে মনে কর তুমি আর আমি, এই দুজন যা ইংরেজিনবিসের আছি। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা করে ঠকিয়ে দেব, সেটা আমার মনঃপুত নয়। এতে হয়তো গোঁসাইগঞ্জ রাগ করতে পারেন— কিন্তু আমি নিজে একজন ইংরেজনবিশ হয়ে, আর একজন ইংরেজনবিশের প্রকাশ্য সভায় অপমান তো করতে পারিনে! আচ্ছা খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি— বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা এর মানে কী বলো দেখি— তুমি জানো নিশ্চয়ই।

— আচ্ছা এর মানে বল— I dont know

হারান মাস্টার উচ্চস্বরে বলিল— "আমি জানি না।"

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সেই মুহূর্তে গোঁসাইগঞ্জের দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুল বেগে নৃত্য ও চিৎকার করিতে লাগিল।

— "হো হো জানে না— নন্দীপুর জানে না— হেরে গেল, দুও— দুও।"

হারান মাস্টার মহাবিপন্নভাবে সকলকে কী বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় গোঁসাইগঞ্জের ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া ও রামশিঙা সমবেতভাবে গর্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা আর কাহারও শ্রুতিগোচর

হইবার সম্ভাবনা রহিল না। গোঁসাইগঞ্জ নিবাসী কয়েকজন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং তন্মধ্যে একজন ব্রজ মাস্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে, বাদ্যভাণ্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন শুনা গেল হারান মাস্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তথায় স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জে ব্রজ মাস্টার অপ্রতিহতভাবে মাস্টার এবং গ্রামস্থ সকলের অপত্য নির্বিশেষে ক্ষীর, ননী, ছানা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পাঠবোধ :

গল্পটিতে মানুষের আত্মম্ভরিতার পরিচয়— যা প্রকাশ পেয়েছে হীরুদত্তের, ব্রজমাস্টারের এবং হারান মাস্টারের কথাবার্তায় তা সর্বজনীন। মানুষের অজ্ঞতা যা গল্পটির কৌতুকরসের কেন্দ্রবিন্দু তার ক্ষমতাটি উপেক্ষা করা যায় না।

শব্দার্থ ও টীকা :

বর্ধিষ্ণু : যা বাড়ছে, সম্বৃদ্ধ হচ্ছে এমন, বর্ধনমুখী
খর্বকায় : বেঁটে।
অভূতপূর্ব : যা আগে কখনো ঘটেনি।
পাংশুবর্ণ : ফ্যাকাশে, মলিন।
অপ্রতিহত : যা রোধ করা যায় না।
পরাভব : পরাজয়।

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) 'মাস্টারমশাই' ছোটোগল্পটির লেখকের নাম কী?
খ) হীরু দত্ত কে?
গ) রামচরণ 'হুস্কুল' বলতে সবাইকে কী বুঝিয়েছিল?
ঘ) নন্দীপুর ইস্কুলের মাস্টারের নাম কী?
ঙ) হীরুদত্ত কোথা থেকে গোঁসাইগঞ্জের জন্য মাস্টার জোগাড় করেছিলেন?
চ) গোঁসাইগঞ্জের ইস্কুলের মাস্টারের নাম কী ছিল?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) "উভয় মাস্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয় গ্রামই স্ব স্ব মাস্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল"—

i. উভয় মাস্টার কে কে?

ii. 'উভয় গ্রামই'— কোন কোন গ্রাম?

খ) "সব খবরই নিয়ে এসেছি"— এখানে সব খবরই বলতে কোন খবরকে বোঝানো হয়েছে?

গ) ব্রজগোপাল মিত্র পূর্বে কোথায় কাজ করতেন?

ঘ) হীরুদত্তের সঙ্গে কারা বারোয়ারি অন্নপূর্ণা পূজা নির্বাহের আলোচনা করছিল?

ঙ) হীরুদত্ত গ্রামের লোকেদের কাছে কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? এবং সেই প্রতিজ্ঞানুসারে তিনি কী করেছিলেন?

৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) ব্রজমাস্টারের ইংরেজি জ্ঞানের সম্যক পরিচয় দাও।

খ) "কিন্তু উভয় গ্রামের লোকই ইংরাজীতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যাহাতে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে কাহার মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে এমন একটি সরল বিচার প্রণালী স্থির করা আবশ্যক'— এই 'সরল বিচার প্রণালীটি' কী?

গ) "সৌভাগ্যক্রমে ব্রজমাস্টার এই কূট প্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন'— ব্রজমাস্টার কে? এই কূট প্রশ্নটি কী ছিল এবং এর অর্থ কী?

ঘ) দুই গ্রামের দুই মাস্টারের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করো।

ঙ) "পরদিন শোনা গেল হারান মাস্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।"— যে ঘটনা এই পরিণতি ডেকে এনেছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

চ) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো :

i। "আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাব বসাব বসাব।— তিন সত্যি করলাম।"

ii। "একেবারে সনইকোয়েল— পুত্রতুল্য। তাঁর ছেলেরা আজও আমায় বোজেদাদা বলতে ইগ্নোরেন্ট— অজ্ঞান।"

দিবসের শেষে

জগদীশ গুপ্ত

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

মানুষের জীবনে অনেকসময়ই স্বতঃজাগরিত উপলব্ধি নির্মম হয়ে ওঠে। যা জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার একটি অন্ধকারময় দিক। প্লেই দিকটিকেই তুলে ধরা হয়েছে এই গল্পে।

লেখক পরিচিতি :

লেখকের পৈতৃক নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খোর্দ মেঘচারিম গ্রামে। পিতা কৈলাশচন্দ্র গুপ্ত কুষ্টিয়া আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। পিতার কর্মসূত্রে জগদীশ গুপ্ত কুষ্টিয়া জেলার আমলাপাড়ায় ১২৯২ বঙ্গাব্দের ২২ আষাঢ় (জুন ১৮৮৬) জন্মগ্রহণ করেন। লেখকের জীবনের অধিকাংশ সময়ই কলকাতায় কাটে।

জগদীশ গুপ্ত প্রথমে কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও ছোটোগল্প লিখেই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। 'বিজলী', 'কালিকলম'', 'কল্লোল' প্রভৃতি সেকালের নতুন ধরনের সব পত্রিকাতেই তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

লেখকের প্রধান গল্পগ্রন্থগুলি হল 'বিনোদিনী', 'রূপের বাহিরে', 'উদয়লেখা', 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী', 'স্বনির্বাচিত গল্প' প্রভৃতি।

উপন্যাস : অসাধু সিদ্ধার্থ, লঘুগুরু, দুলালের দোলা, নিষেধের পটভূমিকায়, কলঙ্কিত তীর্থ ইত্যাদি।

'দিবসের শেষে' গল্পটি 'বিনোদিনী' নামের গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
বিষয়বস্তু এবং প্রকাশরীতি দুদিক থেকেই জগদীশ গুপ্ত বাংলা গল্প উপন্যাসে এক নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন।

মূল পাঠ

রতি নাপিতের বাড়িটার অবস্থানক্ষেত্র বড়ো চমৎকার— বাড়ির পুবে নদী কামদা, পশ্চিমে বাগান ; উত্তরে বেণুবন ; দক্ষিণে যতোদূর দৃষ্টি চলে ততোদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। সূর্যদেব দিগন্তরেখা স্পর্শ করিতে না করিতে তাঁর টকটকে হিঙুল আভাটি রতির গৃহচূড়া চুম্বন করে ; রতি ঠিক পাখির ডাকেই জাগে,— গোধূলিতে তারা বৃক্ষবাসে ফিরিয়া আসিতেই তাদের কলকাকলির সঙ্গে-সঙ্গে সেই শান্তির সুরে সুর মিলাইয়া তার তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে ; দক্ষিণের হাওয়ায় উত্তরে বাঁশ শিরশির করে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি জাগে, সুচিক্কণ শ্যামল দোলের অন্ত থাকে না ; কিন্তু এই এতো বড়ো কাণ্ডটার প্রতি রতির দৃক্‌পাতও নাই— তার চোখ-কান এ-সব দেখিতে শুনিতে শেখে নাই। সে যে চাক্‌রান জমির ভোগ করে তাহাই তার একমাত্র ধ্যান, রতি বস্তুতান্ত্রিক।

একগুঁয়ে কোপনস্বভাব না হইলে রতিকে মন্দ লোক বলা যাইত না ; এবং রতির বাড়ির পশ্চিমে যে বাগান তাহার মালিক যাদব দাস আম-কাঁঠাল সম্বন্ধে তাহাকে যে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাহা যদি অমূলকজ্ঞানে বিশ্বাস না করা যায়, তবে রতি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। কিন্তু লোকে সে-কথা বিশ্বাস করে না। দু-ক্রোশ দূরবর্তী রামচন্দ্রপুরের হাটে রতিকে গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকেই আম-কাঁঠালের কালে আম-কাঁঠাল বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে ; কিন্তু আশ্চর্য এই যে তাহা আহরণের উপায় সম্বন্ধে রতিকে সতর্ক প্রশ্ন করিয়াও তাহারা খুব সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

রতির একটি মাত্র ছেলে, নাম পাঁচু ও বয়েস পাঁচ। রতির স্ত্রী নারানী তিনটি পুত্রকে প্রসবগৃহ হইতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচুগোপালের মাদুলি ধারণ করে— তারপর পেটে আসে এই পাঁচু। তাই অসংখ্য মাদুলি-কবচ-তাবিজ প্রভৃতি আধিদৈবিক প্রহরণ পাঁচুর অঙ্গে নিয়ত উদ্যত থাকিয়া যাবতীয় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রহরা দিতেছে। কিন্তু এতো করিয়াও নারানীর মনে তিলমাত্র স্বস্তি নাই। যুঝিতে-যুঝিতে জাগ্রত মন্ত্র কখন নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই ; দেবতার নির্মাল্য ও প্রসাদ এক সময় কমজোর

হইয়া পড়িতেও পারে— তাই পাঁচু চোখের আড়াল হইলেই নারানীর মনে হয় পাঁচু বুঝি নাই— এমনি সশঙ্ক তার উৎকণ্ঠা।

বহু আরাধনার ধন এই পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াই যে-কথাটি বলিয়া বসিলো তাহা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি অবিশ্বাস্য। নারানী তাহাকে হাত ধরিয়া খেতের দিকে লইয়া যাইতেছিল— নিঃশব্দে যাইতে-যাইতে পাঁচু মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলো, 'মা, আজ আমায় কুমির নেবে।'

নারানী চমকাইয়া উঠিয়া বলিলো, 'সে কী রে?'

'হ্যাঁ, মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।'

'কী ক'রে জানলি?'

পাঁচু বলিলো, 'তা জানিনে।'

ছেলের সর্বনেশে কথা শুনিয়া নারানী প্রথমটা ভয়ানক চমকাইয়া উঠিলেও একটু ভাবিতেই দুর্ভাবনা কাটিয়া তার বুক হাল্কা হইয়া গেলো। পাঁচু অসংলগ্ন অনেক কথাই আজ পর্যন্ত বলিয়াছে ;— একদিন পাঁচু সন্ধ্যাবেলায় একটি পেচককে তাদের ঘরের চালে বসিয়া অট্টহাস্য করিতে দেখিয়াছিল ; আর-একদিন একটি বৃহৎ কচ্ছপকে বাচ্চাসহ তাহাদেরই উঠানে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছিল। এমনই সব অসম্ভব কথা পাঁচু নিত্য বলিয়া থাকে, পাগল ছেলে।

রতি স্ত্রীর মুখে পাঁচুর উক্তি শুনিয়া পাঁচুকেই চোখ রাঙাইয়া ধমকাইয়া দিলো। এই সংশ্রবে তাহার মনে পড়িয়া গেলো তাদেরই গ্রামের মৃত অধর বক্শির কথাটা, অধর বক্শি সেবার নৌকা যাত্রা করিবার ঠিক পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলায় আবছায়া জ্যোৎস্নায় নিজেরই ছায়া দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল,— প্রাঙ্গণে লাফাইয়া-লাফাইয়া সে নিজেরই ছায়ার দিকে আঙুল দেখাইয়া ভীতস্বরে কেবলই চিৎকার করিয়াছিল— ও কে? ও কে?... সে দিন তার রক্তবর্ণ নিষ্পলক চক্ষুর দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া থাকিতে কাহারও সাহস হয় নাই। বহু চেষ্টায় সেদিনকার মতো আতঙ্কের নিবৃত্তি হইয়া সে নিরস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তার নৌকা আর ফেরে নাই, সে-ও না। জনৈক

জ্ঞানী ব্যক্তি সেদিন রতিকে ডাকিয়া বলিয়াছিল,— 'রতি, রকম ভালো নয়, এটা মৃত্যুর লক্ষণ ; এ-রকম মনের ভুল হয় পাগলের কিংবা যার মরণ ঘনিয়েছে।'

কথাটা বর্ণে-বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

তাই রতি ছেলেকে কঠোর কণ্ঠে শাসন করিয়া দিলো, 'খবরদার, ফের যদি ও-কথা মুখে আন্‌বি তবে কাঁচা কঞ্চি তোর পিঠে ভাঙবো।'

তখন আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ— নদী বাড়িয়া চড়া ডুবাইয়া জল খাড়া পাড়ের মৃত্তিকা ছল ছল শব্দে লেহন করিতেছে ; স্বচ্ছ শান্ত জল পঙ্কিল ও খরগতি হইয়া উঠিয়াছে ; তবু ভয়ের কোনো কারণ নাই।— এই নদী, কামদা, তার দুই তীর, আর তার জল তাহাদের চিরপরিচিত ; এ নদী তো নরঘাতিনী রাক্ষসী নহে, স্তন্যদায়িনী জননীর মতো মমতাময়ী— চিরদিন সে গিরিগৃহের সুপেয় শীতল নীর তাদের পল্লি-কুটিরের দুয়ার পর্যন্ত বহিয়া আনিয়া দিতেছে। তাকে ভয় নাই।

স্নানের বেলায় রতি পাঁচুকে ডাকিয়া বলিলো, 'আয়, নেয়ে আসি।'

কাঁচা কঞ্চির ভয়ে পাঁচু সেখানো কোনো প্রতিবাদ না করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেলো ; মায়রে পিঠের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতে তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলো, 'আমি আজ নাইবো না, মা।'

'কেন রে?'

'ভয় করছে।'

নারানী ছেলেকে কোলে করিয়া ঘরের বাহিয়ে আসিয়া বলিলো, 'পাঁচু নাইবে না আজ।'

রতি ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলো, 'কেন, কী হয়েছে?'

'হয়নি কিছু।'

'তবে?'

'নাইতে চাইছে না, থাক্ না আজ।'

রতি আরো শক্ত হইয়া বলিলো, 'না, ওর ভুলটা ভাঙা দরকার। বাবুকে বললুম, শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। তিনি তো হাসলেনই, আরো কতোজনে হাসলে।'

গ্রামের বাবু চৌধুরী মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া চামড়ায় ক্ষুর ঘষিতে-ঘষিতে রতি পাঁচুগোপালরে উদ্ভট যুক্তিটা বিবৃত করিয়াছিল। শুনিয়া বাবু নিজে তো হাসিয়াছিলেনই, উপস্থিত অপরাপর সকলেও হাস্যসংবরণ করিতে পারে নাই। কামদায় কুমির? ইহা অপেক্ষা হাস্যকর উক্তি আর কী হইতে পারে! চৌধুরী বাবু বলিয়াছিলেন, 'না কিছু না, তুই সঙ্গে ক'রে নাইয়ে নিয়ে আসিস্ ; কুমিরে যদি নেয় তো তোকেই নেবে—'

রসিক পোদ্দার বাবুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়াছিল, 'বাবু বলেছেন ঠিক, যাতে তার খোরাক হবে।'

হলধর রাজবংশীবাবুর সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া কলিকা টানিতেছিল ; সে একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিয়াছিল, 'রতি, তুই বাবুর আশ্রয়ে থেকেও এমন অজ্ঞ? তাতে আবার জেতে নাপিত?'

ইত্যাদি বিরক্তির বিদ্রূপে মনে-মনে রুখিয়া উঠিয়া এবং অধর বক্শির এই শ্রেণীর ভুলের দরুন সদ্য-সদ্য নিধনপ্রাপ্তির কথাটা স্মরণ করিয়া, পাঁচুকে আজ নদীতে লইতেই হইবে সংকল্প করিয়া রতি বাড়ি আসিয়াছিল।

নারানী পাঁচুকে বলিলো, 'যাও বাবা, নেয়ো এসো। সঙ্গে বড়ো একটা মানুষ যাচ্ছে— ভয় কিসের?' বলিয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া পাঁচুকে নামাইয়া দিলো। মনে-মনে তাহার সহস্র বৎসর পরমায়ু কামনা করিলো।

অন্যদিন তেল মাখিবার সময় পাঁচু ছটফট করিতো ; আজ সে দাঁড়াইয়া নির্বিবাদে তেল মাখিলো, এবং বাপের গামছাখনা হাতে করিয়া তার পিছন-পিছন ঘাটে নামিলো।

স্নানার্থিগণের উঠা-নামার সুবিধার জন্য পাড় কাটিয়া জল পর্যন্ত ঢালু করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জলের ধার পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া রতি থমকিয়া দাঁড়াইল— তার কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিলো। নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মতো ঝকঝক করিতেছে।... দুর্লঙ্ঘ্য তীব্র স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে— এতো বড়ো একটা গতিবেগ, অথচ তার শব্দ নাই, অবয়ব নাই, ভালো করিয়া সে যেন চোখে পড়ে না ; যেন গঙ্গাধরের

সমস্ত দুঃশাসিত নির্মম শক্তি এই নিঃশব্দ গম্ভীর গতির অনির্দেশ্য বহিরবয়ব ব্যাপিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে।— এমন নিদারুণ নিষ্করুণ রূপ লইয়া এই প্রিয় নদীটি আর কোনোদিন তার চোখে পড়ে নাই। ইহার বাহিরটাই আজ এমন ভয়াবহ, না জানি ইহার দুর্নিরীক্ষ্য অতল গর্ভে কতো হিংসা দংষ্ট্রা মেলিয়া ফিরিতেছে।... রতি শিহরিয়া উঠিলো। শঙ্কিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সম্মুখে দক্ষিণে ও বামে বহুদূর পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলো— নদীর নিষ্কম্প বক্ষে একটি বুদ্‌বুদও কোথাও নাই।... ঠিক সম্মুখে ওপারের বালুচর দুটি গ্রামের বনপ্রান্তের মধ্য দিয়া বহিয়া বহুদূরে গিয়া দিক্‌প্রান্তে মিশিয়াছে— সন্ধিস্থলটা ধূম্রধূসর দীর্ঘ একটা রেখার মতোন! প্রসারিত বালুকারাশির নগ্ন রিক্ত শুভ্রতাকে সবুজ বুটিতে সাজাইয়া দূর-দূরান্তে স্থানে-স্থানে তৃণস্তূপ জন্মিয়াছে।— নদীর দুই তীর নির্জন, নিঃশব্দ। রতি ভাবিতে লাগিলো।...

পাঁচু হঠাৎ সভয়ে একটা চিৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে রতিকে জড়াইয়া ধরিয়া বললো, 'ওটা কী?'

পাঁচুর ভয়ের কারণটাকে রতিও দেখিয়াছিল— একটা জলচর কদাকার জানোয়ার হুশ করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াই ডিগ্‌বাজি খাইয়া তলাইয়া গিয়াছিল।

পাঁচুর ভয় দেখিয়া রতি হাসিয়া বলিলো, 'শুশুক, মাছ তাড়া করেছে।'

পাঁচু জিজ্ঞাসা করিলো, 'কেন, বাবা?'

'খাবে ব'লে।' ওরা বড়ো রুই-কাৎলা মারিয়া খায় শুনিয়া পাঁচুর বিস্ময়ের সীমা রহিলো না— জলের ভিতর তো অন্ধকার, কেমন করিয়া খুঁজিয়া পায়?

এই ক্ষুদ্র ঘটনায় এবং একটু হাসিতে পাইয়া রতির ভয়ে অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেলো। তখন তাহার মনে পড়িলো, কামদায় কুমির ভাসিতে এ-গ্রামের কেউ কখনো দেখে নাই, এমন কি সুদূরের জনশ্রুতি আসিয়াও এ-গ্রামের কানে কখনও পৌছায় নাই। তবে ভয় কিসের?

ঝপ্ করিয়া পাছে গভীর জলে পড়িতে হয়, এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া রতি হাঁটুজলে নামিলো ; পাঁচুকে হাঁটুর কাছে টানিয়া লইলো এবং একহাতে ডানা ধরিয়া অন্য হাতে তার গা মাজিয়া দিলো, দুই ডানা ধরিয়া তাহাকে ডুব দেওয়াইল, তারপর উপরে তুলিয়া গা-মাথা মুছিয়া দিয়া পাঁচুকে বাড়ি পাঠাইয়া দিলো।

রতি হাসিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলো, 'পাঁচু কই রে?' রান্নাঘরের ভিতর হইতে ভারি গলায় পাঁচু বলিলো, 'খাচ্চি, বাবা।'

'কেমন কুমিরে নেয়নি তো?'

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া পাঁচুও হাসিতে-হাসিতে বলিলো, 'না।'

নারানী বলিলো, 'ছেলের আমার এতোক্ষণে হাসি ফুটেছে।'

সেইদিন বিকালে ঘুম ভাঙিয়া নারানী বারান্দায় আসিতেই তাহাকে দেখিয়া পাঁচুরই সমবয়সী অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে বিদ্যুৎদ্বেগে অদৃশ্য হইয়া গেলো। তাহাদের এই অকস্মাৎ পলায়নের হেতু নির্ণয় করিতে আসিয়া যে-ব্যাপারের ভগ্নাবশেষ নারানীর চোখে পড়িলো তাহার তুলনা বুঝি কোথাও নাই। নারানী গালে হাত দিয়া একেবারে থ হইয়া গেলো। হাঁকিলো, 'পাঁচু?'

পাঁচুর সঙ্গীরা বোধহয় এক দৌড়ে বাড়ি যাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পাঁচু তাহাদের দেখাদেখি ছুটিতে আরম্ভ করিলেও বাড়ির সীমানার বাহিরে যাইতে পারে নাই। মায়ের ডাক শুনিয়া সে রান্নাঘরের আড়াল হইতে বাহির হইয়া অত্যন্ত জড়োসড়োভাবে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ছেলের মূর্তি দেখিয়া নারানীর ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিলো।

ব্যাপার এই—

নারানী যখন ঘুমাইতেছিল তখন পাঁচু ও তার সঙ্গীরা ঘরে রাখা ছোটো একটা পাকা কাঁঠাল চুরি করিয়া ভাঙিয়া খাইতেছে, কিন্তু কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইবার ঠিক পদ্ধতিটি জানা না থাকায় ছেলে কাঁঠালের গাঢ়রসে সর্বদেহ আপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছে— তাহার উপর আনন্দের আবেগে উঠানের ধূলায় গড়াগড়িও দিয়াছে ; কাজেই ছেলের মূর্তি দেখিয়া মায়ের ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিবারই কথা।

অপরাধীগণের মধ্যে পাঁচুই একা ধরা পড়িয়া মায়ের রুষ্ট চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াই কাঁদিয়া ফেলিলো।

পাঁচু মার খাইতে-খাইতে বাঁচিয়া গেলো— এতো বেলা পর্যন্ত সে যে বড়ো ত্রাসের ক্লেশ সহ্য করিয়াছে ; কিন্তু তার অকারণ আর্তনাদে এবং নারানীর ক্রুদ্ধ চিৎকারে রতির ঘুম ভাঙিয়া গেলো। সে বাহিরে আসিয়া গা-মোড়া দিয়া বলিলো, 'যেমন ছেলের গলা তেম্‌নি তার— হয়েছে কী?'

নারানী বলিলো, 'হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ, চুরি ক'রে কাঁঠাল খাওয়া হয়েছে। ছেলের বিদ্যে কতো!'— বলিয়া সে এমনিভাবে রতির দিকে চাহিলো যেন চুরি করিয়া কাঁঠাল খাওয়াটা পুরুষজাতের মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক।

রতি ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলো, 'থামো, আর চেঁচিও না। আমি গিয়ে ধুইয়ে আনছি ; তা হ'লে তো হবে?' বলিয়া সে উঠানে নামিলো।

পাঁচুর হাতে খেলার একটা ঘট ছিলো— সেইটি হাতে করিয়া অপরাধী পাঁচু চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে বাপের আগে-আগে নদীর দিকে চলিলো।... রতি তাহাকে জ্বলে ফেলিয়া বেশ করিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া তুলিয়া আনিলো। খানিকটা দূর উঠিয়া আসিয়া পাঁচু হঠাৎ থামিয়া বলিয়া উঠিলো, 'বাবা আমার ঘট?'

উভয়েই ফিরিয়া দেখিলো, জলের ধারেই ঘট পড়িয়া আছে।

পাঁচু আকুল হইয়া বলিলো, 'নিয়ে আসি, বাবা?'

রতি বলিলো, 'যা।'

পাঁচু হেঁট হইয়া ঘট তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দুটি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিলো ; পরমুহূর্তেই সে-স্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিলো, লেজটা একবার চমক দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেলো— এবং চোখের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেলো।... মুদ্রিতচক্ষু আড়ষ্টজিহ্ব ভয়ার্ত রতির স্তম্ভিত বিমূঢ় ভাবটা কাটিতে বেশি সময় লাগিলো না— পরক্ষণেই তাহার মুহুর্মুহু তীব্র আর্তনাদে দেখিতে-দেখিতে নদীতীর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিলো।

যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেলো তখন সে কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল।... জনতা হায় হায় করিয়া উঠলো, পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিলো...সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেলো।

কেবল পাঁচুর মা সে দৃশ্য দেখিলো না। সে তখন মূর্ছিতা।

পাঠবোধ :

এই গল্পে কুচক্রী নিয়তির আবির্ভাব ঘটেছে কাকতালীয়ভাবে তবে কিন্তু শিশু পাঁচুর মনে হঠাৎ জেগে ওঠা উপলব্ধির সঙ্গে এখানে দেখতে পাই মায়ের সহজাত আতঙ্ককেও। পাঁচুর আগে নারানীর তিনটি সন্তান মারা গিয়েছিল, সেই থেকে একটি আতঙ্ক তার মনে জন্মলাভ করেছিল ; পাঁচুকেও বুঝি হারাতে হবে। পূর্ব-ঘটিত ব্যাপার মানুষের মনের ভাবনাকে প্রভাবিত করে— এই সর্বজনীন সত্যটির ধারক ও বাহক নারানী। এই সত্যটি ছাত্রছাত্রীদের বোধের সীমানায় পৌঁছে দেওয়াই এই গল্পটির একমাত্র উদ্দেশ্য।

শব্দার্থ

আভা : দীপ্তি।
দৃক্‌পাত : দৃষ্টি-নিক্ষেপ।
আহরণের : সংগ্রহের, সঞ্চয়ের।
নিদ্রাভিভূত : ঘুমে বিভোর।
অসংলগ্ন : অবান্তর।
প্রাঙ্গণে : উঠানে।
নিষ্পলক : চোখের পলক না ফেলে।
নিবৃত্তি : ক্ষান্তি, নিস্তরঙ্গ, ঢেউশূন্য।
আবিল : ঘোলাটে।
দুর্নিরীক্ষ্য : যা দৃষ্টিগোচর করা কঠিন।
কদাকার : কুৎসিত।
পাণ্ডুর : ফ্যাকাশে, ম্লান।
আপ্লুত : সম্পূর্ণ সিক্ত (ভেজা), স্নাত।

টীকা :

চাক্‌রাণ জমি— চাকরকে মাইনের পরিবর্তে প্রদত্ত জমি।
জনশ্রুতি— যেসব কথা জনমুখে শ্রুত বা শোনা যায়।

প্রশ্নাবলি :

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) 'দিবসের শেষে' ছোটগল্পটির লেখক কে?

খ) 'দিবসের শেষে' গল্পটি লেখকের কোন গল্পসংগ্রহ থেকে গৃহীত হয়েছে?

গ) রতি নাপিতের বাড়ির পূর্বদিকে কোন নদী প্রবাহিত?

ঘ) রতির ছেলের নাম কী?

ঙ) নারানী কে?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) পাঁচুর অসংলগ্ন কথার দুটি উদাহরণ দাও।

খ) "বহু আরাধনার ধন এই পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াই যে কথাটি বলিয়া বসিল তাহা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি অবিশ্বাস্য।"

i) 'ভয়ঙ্কর ও অবিশ্বাস' কথাটি কী?

ii) পাঁচুকে কেন বহু 'আরাধনার ধন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে?

গ) "রতি স্ত্রীর মুখে পাঁচুর উক্তি শুনিয়া পাঁচুকেই চোখ রাঙাইয়া ধমকাইয়া দিল। এই সংশ্রবে তাহার মনে পড়িয়া গেল তাহাদেরই গ্রামের মৃত অধর বক্শির কথাটা"— মৃত অধর বক্শির কথাটি কী?

ঘ) "সেইদিন বিকালে ঘুম ভাঙিয়া নারানী বারান্দায় আসিতেই তাহাকে দেখিয়া পাঁচুরই সমবয়সি অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে বিদ্যুদ্বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল"— বিদ্যুদ্‌বেগে বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 'ছেলে-মেয়ে'দের বিদ্যুদ্‌বেগে অদৃশ্য হবার কারণ কী?

ঙ) "ছেলের আমার এতক্ষণে হাসি ফুটেছে।" বক্তা কে? ছেলের মুখে হাসি ফোটবার কারণ কী?

৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) "নিয়তি অমোঘ, তার কাছে মানুষ অসহায়'— 'দিবসের শেষে' গল্প অবলম্বনে বাক্যটির সত্যততা নিরূপণ করো।

খ) "ছেলের সর্বনেশে কথা শুনিয়া নারানী প্রথমটা ভয়ানক চমকাইয়া উঠিলেও একটু ভাবিতেই দুর্ভাবনা কাটিয়া তার বুক হাল্কা হইয়া গেল"—

i। নারানী কে? তার ছেলের নাম কী?

ii। ছেলের কোন্ কথাকে 'সর্বনেশে' কথা বলা হয়েছে?

iii। কোন্ ভাবনা নারানীর বুক হাল্কা করল?

iv। 'ছেলের সর্বনেশে কথা' কীভাবে বাস্তব রূপ নিয়েছিল, তা বিবৃত করো।

গ) "কেবল পাঁচুর মা সে-দৃশ্য দেখিল না।'

i। পাঁচুর মায়ের নাম কী?

ii। পাঁচুর মা কেন 'সে দশ্য' দেখতে পায়নি?

iii। 'সে দৃশ্য'টি কী, তা বর্ণনা করো।

ঘ) "রতি আরও শক্ত হইয়া বলিল, "না, ওর ভুলটা ভাঙা দরকার।""

i। রতি কে?

ii। 'ওর ভুলটা'— কার ভুলটা? 'ও' সত্যিই কি কোনো ভুল করেছিল? যুক্তি দেখিয়ে উত্তর দাও।

iii। 'ওর ভুলটা' ভাঙবার জন্য রতি কী করল?

ঙ) প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লেখো—

i। "এই ক্ষুদ্র ঘটনায় এবং একটু হাসিতে পাইয়া রতির ভয়ে অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেল।"

ii। '... সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।"

গণেশ জননী

বনফুল

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য ঃ

'বনফুল' আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলা ছোটগল্পকে তিনি এক মাত্রা দান করেন। 'অণুগল্প' নামে এক বিশিষ্ট গল্পধারার তিনিই প্রবর্তক। তাঁর রচনার সঙ্গে উচ্চতর মাধ্যমিকের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে এই গল্পটি নির্বাচিত করা হয়েছে। গল্পটিতে মানুষ ও জীব-জন্তুর আন্তরিকতার সম্পর্কটিকে বিশেষ সুষমায় মণ্ডিত করে পরিবেশন করা হয়েছে।

লেখক পরিচিতি :

'বনফুল' ছদ্মনামে সুপরিচিত বাংলাসাহিত্যের দক্ষ ছোটগল্পকারের প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই, বিহারে। প্রাথমিক শিক্ষাও বিহারে, বিহারেই কেটেছে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়। কলকাতায় তিনি ডাক্তারি পড়েন, পরবর্তী জীবনে সুচিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু মূল আগ্রহ ছিল সাহিত্যে। তিনি রচনা করেছেন 'তৃণখণ্ড', 'দ্বৈরথ', 'মৃগয়া', 'ডানা', 'স্থাবর', 'কিছুক্ষণ', 'জঙ্গম' প্রভৃতি উপন্যাস ; 'শ্রীমধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর', 'রূপান্তর', 'কঞ্চি' ইত্যাদি নাটক। তাঁর ছোটগল্প সংকলনের মধ্যে রয়েছে 'বৈতরণীর তীরে', 'বনফুলের গল্প', 'বনফুলের আরো গল্প' ইত্যাদি। 'বনফুলের কবিতা' তাঁর বিখ্যাত কাব্যসংকলন।

১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি দেহত্যাগ করেন।

মূল পাঠ

আমি পশু চিকিৎসা করি। যে দেশে অসুস্থ মানুষেরই ভাল করিয়া চিকিৎসা হয় না সে দেশে পশু চিকিৎসা করিয়া কি প্রকারে আমার জীবিকা নির্বাহ হয় এ প্রশ্ন যাঁহাদের মনে জাগিতেছে তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত জানাইতেছি যে, আমি সরকারী পশু-চিকিৎসা বিভাগে চাকুরি করি। কমিশনার সাহাবের ঘোড়া, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুকুর, পুলিশ সাহেবের গাভী প্রকৃতির স্বাস্থ্য তদারক করিয়া, ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া 'পাস' করিয়া আমার অন্ন সংস্থান হয়। মনুষ্য-চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিসের মতো নির্ভরযোগ্য 'প্র্যাকটিস' আমাদের নাই। এই পরাধীন দরিদ্র দেশে থাকিবার কথাও নয়। তবু মাঝে মাঝে দু'একটা 'কল' জোটে। সেদিন এমনি একটি অপ্রত্যাশিত 'কল' জুটিল। একটি জরুরি তার পাইলাম। 'আমার হস্তী অসুস্থ— অবিলম্বে চলিয়া আসুন।' উল্লসিত হইলাম। মোটা টাকা পাওয়া যাইবে। যেখানে যাইতে হইবে তাহা ট্রেনযোগে সাত-আট ঘণ্টার পথ। এতদূর যাইতে হইবে, হাতীর অসুখ খুব কম করিয়া ধরিলেও দুইশত টাকা 'ফি' পাওয়া যাইবে। বাক্সপ্যাঁটরা-বাঁধিয়া সানন্দে বাহির হইয়া পড়িলাম। সামনেই পূজা... বিরাট পরিবার... ভগবান জুটাইয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো গেল। মফস্বল জায়গা, ছোট গ্রাম। স্টেশনটি ছোট। বেশি যাত্রী নাই। সেকেণ্ড ক্লাসে আমিই একমাত্র লোক। স্টাইল জাহির করিবার নিমিত্ত সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট করিয়াছিলাম। যিনি আমাকে স্টেশন হইতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া হাতল ঘুরাইয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া সসম্ভ্রমে আমাকে প্রশ্ন করিলেন— "আপনি কি ভেটেরেনারি সার্জন?"

"হ্যাঁ।"

"আসুন, আসুন, আমি আপনাকেই নিতে এসেছি।"

তাড়াতাড়ি আমার সুটকেশটা ভদ্রলোক তুলিয়া লইলেন। গোমস্তার মতো চেহারা। পায়ে মলিন ক্যাম্বিসের জুতো, গায়েও মলিন জামা কাপড়, এক মুখ খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়ি, পাঁচ-সাত দিন কামানো হয় নাই। আমি ভাবিলাম, যে জমিদারের হাতী ইনি বোধ হয় তাঁহারই কর্মচারী।... স্টেশন হইতে বাহির হইলাম। আশা করিতেছিলাম মোটর বা ওই জাতীয়

কিছু একটা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু দেখিলাম সে সব কিছুই নাই। ভদ্রলোক সাইকেল চড়িয়া আসিয়াছিলেন। সাইকেলটি স্টেশনের বাহিরের দেওয়ালে ঠেসানো ছিল। তিনি আমার জন্য একটি ছ্যাকড়া গাড়ি দিয়া সাইকেলে আরোহণ করিলেন। খানিকক্ষণ পরে ছ্যাকড়া গাড়ি একটি বাড়ির সম্মুখে থামিল। গাড়ির জানলা হইতে মুখ বাড়াইলাম। স্বল্পালোকে যে বাড়িটা চোখে পড়িল তাহা কোন বড়লোকের বাড়ি বলিয়া মনে হইল না। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি। এ বাড়ির মালিকের হাতী পুষিবার কথা নয়। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিব কিনা ভাবিতেছিলাম এমন সময় একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। সাইকেল যোগে তিনি আগেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। সাগ্রহে আহ্বান করিলেন, "আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন— এই ঘরে— হ্যাঁ—" তাঁহার বাহিরের ঘরটিতে গিয়া বসিলাম।

একটি চৌকি, একটি দড়ির ছেঁড়া খাটিয়া, এক নড়বড়ে টেবিল, গোটা দুই ক্যালেণ্ডারের ছবি— ইহাই সে ঘরটিতে সাজসজ্জা। ভদ্রলোক আমার সুটকেশটি ঘরের এক কোণে নামাইয়া আমার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া বলিলেন— "এক মিনিট বসুন, আমি একবার বাড়ির ভিতর থেকে আসি। দেখি, চা হল কি না!"

"আমার রুগী কোথায়?"

"এইখানেই আছে। আমারই হাতী..."

ভদ্রলোক ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বিস্মিত হইলাম। লোকটা রসিকতা করিতেছে না কি!

মিনিট খানেক পরেই তিনি হাতল-ভাঙা 'কাপে' এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

"আগে চা-টা খেয়ে নিন, তারপর রুগী দেখবেন।"

"হয়েছে কি?"

"বিশেষ কিছু নয়, খাওয়া বন্ধ হয়েছে।"

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "আমার দিক থেকে অবশ্য সুবিধে, হাতীর খোরাক যোগাতে হচ্ছে না, কিন্তু গিন্নিও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে, তাই

মুশকিলে পড়ে গেছি—" ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"হাতী পুষেছেন কি শখ করে?"

"আরে না মশাই। জুটে গেছল, গরীব গেরস্ত মানুষ, হাতী পোষবার শখ হতে যাবে কেন—"

চায়ের খালি পেয়ালাটা পাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিলাম, "কি রকম?"

"সে কি আজকের কথা/ আমার কিছু ক্ষেত খামার আছে বুঝলেন, আপনাদের আশীর্বাদে চাকরি করে খেতে হয় না। বছর দশেক আগে একদিন অনেক রাত্রে মাঠ থেকে ফিরছি হঠাৎ নজর পড়ল একটা লোক মুখ গুঁজড়ে মাঠের মাঝখানে পড়ে আছে ঝুঁকে দেখলাম একেবারে অজ্ঞান। লোকজন ডেকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে এলাম। সেবা-শুশ্রূষা করাতে তার জ্ঞান হল। পরিচয় হতে জানতে পারলাম সে একজন কচ্ছি। ব্যবসাদার। ঘোড়া ছুটিয়ে মাঠামাঠি আসছিল, ঘোড়াটা তাকে ফেলে পালিয়েছে। পর দিনই তার লোকজন এসে পড়ল, ঘোড়াটিও পাওয়া গেল। আমাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল সে। কয়েকদিন পরে দেখি একটা লোক ছোট্ট একটি হাতীর বাচ্চা নিয়ে এসে হাজির— সেই কচ্ছি ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন। তিনি নাকী হাতীর ব্যবসা করেন। একটি চিঠিও লিখেছেন— আপনারা আমাদের প্রাণদান করেছেন, বিনিময়ে আপনাদের কি আর দিতে পারি, সামান্য উপহার পাঠালাম, গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। হাতীর বাচ্চাটি দেখতে চমৎকার— তখন ছোট্ট ছিল— দুষ্টু দুষ্টু চোখ, ছোট্ট শুঁড়, খুব ভাল লাগল তখন। গিন্নি তো একেবারে আনন্দে আত্মহারা। বললে— ও আমার গণেশ এসেছে। বলেই তার সামনে একবাটি দুধ এগিয়ে দিলেন। বাস্, সেই থেকেই গণেশ থেকে গেল। আমাদের ছেলেপিলেও হয় নি, ওই গণেশই আমাদের সব।"

ভদ্রলোক চুপ করলেন। আমি সবিস্ময়ে শুনিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম— "আপনাদের এইটুকু বাসায় ওকে রাখেন কোথায়?"

"উঠোনের দিকে জায়গা আছে অনেকখানি। তাছাড়া সব বাড়িটাই তো ওর— দরজা দেখছেন না— সব কেটে কেটে বড় করতে হয়েছে যাতে ও যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে পারে— আমরাই সসঙ্কোচে একধারে বাস করি।"

ভদ্রলোক অকৃত্রিম আনন্দে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"গণেশের পান থেকে চুন খসবার জো নেই, তাহলেই গিন্নি তুলকালাম করবে। একশ' বিঘে জমি আছে মশাই— যা কিছু হয় সব ওরই পেটে যায়— একটা হাতীর খোরাক বুঝছেন না? পূজোর সময় ওর সাজ করিয়ে দিতে হয়— এবার গিন্নি একটা রূপোর ঘণ্টা করিয়ে দিয়েছে... স্যাকরার ধার শোধ করতে পারিনি এখনও..."

ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হাতী পোষার নানাবিধ অসুবিধের কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়া গৃহিণীর ঘাড়ে তিনি দোষ চাপাইতেছেন বটে, কিন্তু গণেশকে লইয়া তিনি যে সত্যই বিব্রত তাহা তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া মনে হইল না।

"খুব পোষ মেনেছে?"

"পোষ মেনেছে মানে! গিন্নি যখন নাইতে যায়, বালতি-গামছা শুঁড়ে করে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গণেশ পিছু পিছু যায়। গরমের দিনে রান্নাঘরে বসে গিন্নি রাঁধে ও শুঁড়ে করে পাখা ধরে হাওয়া করে।"

"রান্নাঘরে ও ঢুকতে পারে?"

"আরে মশাই আমাদের ঘর কি আর মানুষের ঘর আছে, হাতীর ঘর হয়ে গেছে। এই বাইরের ঘরটিই যা ছোট, এ ছাড়া আর দুটি ঘর আছে— এক রান্না ভাঁড়ার আর একটি শোবার— দুটোই বিরাট 'হল'— মানে 'হল' করতে হয়েছে... ওর জন্যে... বাইরের ঘরের দরজাই দেখুন না... এই দিক দিয়ে উনি বেড়াতে বেরোন, কেটে বড় করতে হয়েছে..."

"আপনাদের সব কথা বোঝে?"

"সমস্ত। মানুষ একেবারে। মান-অভিমান পর্যন্ত করে। এই যে খাওয়া বন্ধ করেছে, আমার বিশ্বাস সেটা অভিমানে।"

"কেন, কিছু হয়েছিল না কি?"

"বাগান থেকে ল্যাংড়া আম এসেছিল মশাই— মালী দিয়ে গিয়েছিল— আমি বাড়ি ছিলাম না, গিন্নিও পাড়ায় কোথা বেরিয়েছিলেন— এসে দেখেন একটি আমও নেই। সব গণশা খেয়েছে। তাই গিন্নি একটি চাপড় মেরে বলেছিলেন— রাক্ষস, সব খেয়ে বসে আছ, একটি রাখতে পার নি আমাদের জন্যে। সেই যে ফোঁস করে গুম মেরে বসেছে, তার পর থেকে আর জল

স্পর্শ করে নি। এরকম মাঝে মাঝে করেও। একটু বকলে ঝকলেই খাওয়া বন্ধ করে দেয়... কিন্তু এরকম একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা খাওয়া বন্ধ আর কখনও করে নি... তাছাড়া অতগুলো আম খেয়েছে তো— ভয় হয়ে গেছে আমাদের..."

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল।

"চলুন দেখি গিয়ে।"

ভিতরে গিয়া দেখি একটি বিরাট 'হলে' প্রকাণ্ড শতরঞ্জির উপর গণেশ গুম হইয়া বসিয়া আছে। একটি ক্ষীণকায়া মহিলা তার শুঁড়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তাকে খাইবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড একটি 'বাথ টপ' কি একটা জলীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং তাহার পাশে লেবুর খোসার স্তূপ।

"খাও লক্ষ্মী তো— লেবু দিয়ে কেমন সুন্দর বার্লি করে এনেছি। চেখেই দেখ না একটু—"

গণেশ কুলার মত কান দুটি নাড়িয়া ফোঁস করিয়া শব্দ করিল।

মহিলা আমার দিকে তাকাইয়া সজলকণ্ঠে বলিলেন, "ওর নিশ্চয় কোন অসুখ করেছে— ওকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন আপনি।"

দেখিলাম। রোগের কোন চিহ্ন পাইলাম না। গণেশ সম্পূর্ণ সুস্থ। ব্যাপারটা অভিমানই।

ফিরিবার সময় কর্তা বলিলেন— "আপনার দক্ষিণা কত দিতে হবে ডাক্তারবাবু—"

"অপরের কাছে হলে দু'শ টাকা নিতাম কিন্তু আপনার কাছে কিছু নেব না।"

"না, না, তা কি হয়! এত কষ্ট করে এসেছেন—"

"না, আমি নেব না—"

কিছুতেই লইতে রাজী হইলাম না। তখন তিনি বারান্দায় গিয়া দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন— "তাহলে আর টাকার দরকার হবে না পোদ্দার। গয়নাগুলো তুমি ফেরত দিয়া যাও।"

বুঝিলাম গণেশজননী নিজের গহনা বন্ধক দিয়া আমার 'ফি' সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পাঠবোধ :

জীবজগতের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক চিরকালীন। ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন পর্বে এই সম্পর্কের কথা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে এর পরিচয় লক্ষ করা যায়। বস্তুত গৃহপালিত পশু-পাখি পরিবারেরই এক সদস্য হয়ে ওঠে। মানুষের মতোই তাদেরও মনে ভাব-ভালোবাসা, মান-অভিমান তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। প্রতিপালকের জন্য জীবন উৎসর্গ করে ভারতীয় ইতিহাসের গল্পগাথায় অমর হয়ে আছে রাণা প্রতাপের প্রিয় ঘোড়া 'চৈতক'। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পের গফুর তার প্রিয় পোষ্য 'মহেশ'-এর জন্য সামাজিক লাঞ্ছনাকে বিনা দ্বিধায় শিরোধার্য করে নিয়েছিল। 'বনফুল'-এর এই 'গণেশ জননী' গল্পেও সন্তানবৎ পোষ্য গণেশের চিকিৎসার জন্য প্রতিপালকের স্ত্রী নিজের স্বর্ণালংকার বন্ধক রাখতেও দ্বিধাবোধ করেননি। মাতা যেমন সন্তানের জন্য নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন, ঠিক তেমনই গণেশজননী সেই ভদ্রমহিলা প্রিয় পোষ্যের চিকিৎসার জন্য সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর ভালোবাসা, সন্তান বাৎসল্য জীবজগতের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক এক নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

শব্দার্থ ও টীকা :

জীবিকা : জীবনধারণের উপায়, বৃত্তি।

ছ্যাক্‌ড়া গাড়ি : ঘোড়ার গাড়ি।

জরুরি তার : অতি প্রয়োজনীয় টেলিগ্রাম। এখানে 'তার' শব্দের অর্থ 'টেলিগ্রাম'।

মফস্বল : রাজধানী বা জেলার প্রধান শহর ব্যতীত অন্যান্য স্থান।

গোমস্তা : জমিদারের খাজনা আদায়কারী প্রতিনিধি।

শতরঞ্জি : সুতির মোটা চাদর। বড়ো গালিচা।

গুম : এখানে গুম হয়ে থাকার অর্থ কোনো কথা না বলে গম্ভীরভাবে চুপচাপ থাকা।

বন্ধক : ঋণের বিনিময়ে গচ্ছিত বস্তু।

ফি : পারিশ্রমিক।

কচ্ছি : গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলের অধিবাসী।

প্রশ্নাবলি :

১। ক) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) 'গণেশ জননী' গল্পের লেখকের জীবিকা কী?

খ) 'গণেশ জননী' গল্পের লেখক কোন বিভাগে চাকরি করতেন?

গ) 'সেদিন এমনি একটি অপ্রত্যাশিত —— জুটিল! (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)

ঘ) 'গণেশ জননী' গল্পের লেখক সেকেন্ড ক্লাশের রেলের টিকিট কিনেছিলেন কেন?

ঙ) হাতির বাচ্চাটির নাম কে রেখেছিলেন?

চ) গণেশ কত ঘণ্টা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে রেখেছিল?

ছ) গণেশ কোথায় বসেছিল?

জ) প্রতিপালক এবং প্রতিপালক গিন্নির অনুপস্থিতিতে গণেশ কী খেয়েছিল?

ঝ) গণেশের প্রতিপালক ভদ্রলোকের কত বিঘা জমি ছিল?

ঞ) গণেশ জননী গণেশের জন্য কী বানিয়ে দিয়েছিলেন?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) 'হাতীর বাচ্চাটি দেখতে চমৎকার'— হাতির বাচ্চাটির বর্ণনা দাও।

খ) গণেশ তার পালক-গিন্নির বিভিন্ন কাজে কীভাবে সাহায্য করত, তার বর্ণনা দাও।

গ) গণেশের প্রতিপালক পশু-চিকিৎসককে ডেকেছিলেন কেন? হাতিটির কী অসুখ হয়েছিল?

ঘ) গণেশ কেন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল?

ঙ) প্রতিপালকের গিন্নি গণেশের খাওয়ার জন্য কী তৈরি করেছিলেন? এবং সেই খাদ্য কোথায় রেখেছিলেন?

চ) বাড়িতে গণেশের অবাধ বিচরণের জন্য গণেশের প্রতিপালক ভদ্রলোক কী করেছিলেন?

৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) 'গণেশ জননী' গল্পের লেখককে চাকরি জীবনে কী কী করতে হত?

খ) 'গণেশ জননী' গল্পের লেখককে স্টেশন থেকে নিয়ে যাবার জন্য যে

ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁর চেহারা এবং পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা দাও।

গ) 'গণেশ জননী' গল্পের ভদ্রলোক হাতি কীভাবে পেয়েছিলেন?

ঘ) "আরে মশাই আমাদের ঘর কি আর মানুষের ঘর আছে, হাতীর ঘর হয়ে গেছে"— এই উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

ঙ) 'গণেশ জননী' গল্পে 'গণেশ জননী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? কেন?

চ) 'গণেশ জননী' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

ছ) 'গণেশ জননী' গল্পে গণেশের প্রতিপালক ভদ্রলোকের চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

জ) 'গণেশ জননী' গল্পের পশুচিকিৎসক রোগী দেখার 'ফি' নেননি কেন?

ঝ) 'গণেশ জননী' গল্পে মানুষ এবং জীবজগতের যে সম্প্রীতি এবং বাৎসল্যের ছবি প্রকাশিত হয়েছে, তা পরিস্ফুট করো।

ঞ) ব্যাখ্যা করো :

"তাহলে আর টাকার দরকার হবে না পোদ্দার। গয়নাগুলো তুমি ফেরত দিয়া যাও।"

ভাত

মহাশ্বেতা দেবী

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য

মহাশ্বেতা দেবী বিশ শতকের অন্যতম সাহিত্যিক। তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি গ্রামগঞ্জে ঘুরে সাধারণ মানুষের জীবন দেখেছেন, তাদের জীবনযুদ্ধের শরিক হয়েছেন। এ সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে।

লেখক পরিচিতি

১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি মহাশ্বেতা দেবী ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কবি, সাহিত্যিক মণীশ ঘটক। মাতা ধরিত্রী দেবী, সাহিত্যপ্রেমী ও সমাজসেবী। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করেন। কর্মজীবনেও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৪ সালে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে স্থায়ী হন। ১৯৮৪ সালে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করেন। মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম মুদ্রিত লেখা রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' নিয়ে ১৯৩৯ সালে খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'রংমশাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ঝাঁসীর রাণী' সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস 'নটী' হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়।

গল্প, উপন্যাস, অনুবাদ, জীবনী ইত্যাদি মিলিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর বইয়ের সংখ্যা শতাধিক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল— 'অরণ্যের অধিকার', 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু', 'তিতুমীর', 'হাজার চুরাশির মা' ইত্যাদি।

তিনি 'ত্রৈমাসিক বর্তিকা' সম্পাদনাও করেছেন। জীবনে বহু পুরস্কার ও

সম্মান লাভ করেছেন তিনি। তার মধ্যে কয়েকটি হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৯), ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' [আদিবাসী ক্ষেত্রে কাজের জন্য (১৯৮৬)], জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, ম্যাগস্যাসে পুরস্কার ইত্যাদি। ২০১৬ সালে এই প্রতিভাময়ী লেখিকা ইহলীলা সংবরণ করেন।

মূল পাঠ

লোকটার চাহনি বড়ো বাড়ির বড়ো বউয়ের প্রথম থেকেই ভালো লাগেনি। কী রকম যেন উগ্র চাহনি। আর কোমর পর্যন্ত ময়লা লুঙ্গিটা অত্যন্তই ছোটো। চেহারাটা বুনো বুনো। কিন্তু বামুন ঠাকুর বলল, ভাত খাবে কাজ করবে।

— কোথা থেকে আনলে?

এ সংসারে সব কিছুই চলে বড়ো পিসিমার নিয়মে। বড়ো পিসিমা বড়ো বউয়ের পিসি শাশুড়ি হন। খুবই অদ্ভুত কথা। তাঁর বিয়ে হয়নি।

সবাই বলে, সংসার ঠেলবার কারণে অমন বড়োলোক হয়েও ওরা মেয়ের বিয়ে দেয়নি। তখন বউ মরে গেলে বুড়ো কর্তা সংসার নিয়ে নাটা-ঝামটা হচ্ছিল।

বড়ো বাড়ির লোকরা বলে, ওঁর বিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে। উনি হলেন দেবতার সেবিকা।

বড়ো বাড়িতে শিবমন্দিরও আছে একটা। বুড়ো কর্তা এ রাস্তার সবগুলো বাড়িই শিব-মহেশ্বর-ত্রিলোচন-উমাপতি, এমন বহু নামে শিবকে দিয়ে রেখেছিলেন। দূরদর্শী লোক ছিলেন। তাঁর জন্যই এরা করে খাচ্ছে। বড়ো পিসিমা নাকি বলেছিলেন, উনি আমার পতি দেবতা। মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিও না।

এসব কথা সত্যি না মিথ্যে কে জানে। বড়ো পিসিমা চিরকাল এ সংসারে হেঁসেল দেখেছেন, ভাড়াটে বাড়িতে মিস্তিরি লাগিয়েছেন এবং তাঁর বাবার সেবা করেছেন।

বড়ো বউয়ের কথা শুনে বড়ো পিসিমা বলেন, কোথা থেকে আনলে

মানে? ঝড়জলে দেশ ভেসে গেছে। আমাদের বাসিনীর কে হয়। সেই ডেকে আনলে।

বড়ো বউ বলে, কী রকম দেখতে।

— ময়ূরছাড়া কার্তিক আসবে নাকি? তোমরা তো দশটা পয়সা দিতে পারবে না প্রাণে ধরে। এই চোদ্দ দফায় কাজ করবে, পেটে দুটো খাবে বই তো নয়। কেনা চাল নয়, বাদা থেকে চাল আসছে। তা দিতেও আঙুল বেঁকে যাচ্চে?

বড়ো বউ চুপ করে যায়। বড়ো পিসির কথায় আজকাল কেমন যেন একটা ঠেস থাকে। 'তোমাদের' মানে কি? বড়ো পিসিমা কি অন্য বাড়ির লোক নাকি?

বড়ো পিসিমা শেষ খোঁচাটা মারেন। তোমরা শ্বশুরই মরতে বসেচে বাছা। সে জন্যেই হোম-যজ্ঞি হচ্ছে। তার জন্য একটা লোক খাবে...

বড়ো বউ কোনো কথা বলে না। সব কথাই সত্যি। তার শ্বশুর মরতে বসেছেন। বিরাশি বছরটা অনেক বয়েস। কিন্তু শ্বশুর বেশ টনকো ছিলেন। তবে ক্যানসার বলে কথা। ক্যানসার যে লিভারে হয় তাই বড়ো বউ জানত না। বড়ো বউ দৌড়ে চলে যায়।

আজ অনেক কাজ। মেজ বউ উনোন পাড়ে বসেছে। শাশুড়ি মাছ খাওয়া বুঝি ঘুচে যায়। তাই কয়েকদিন ধরে বড়ো ইলিশ, পাকা পোনার পেটি, চিতলের কোল, ডিমপোরা ট্যাংরা, বড়ো ভেটকি মাছের যজ্ঞি লেগেছে। রেঁধে-বেড়ে শাশুড়িকে খাওয়ানো তার কাজ।

শ্বশুরের ঘরে নার্স। বড়ো বউ এখন গেল সে ঘরে। সে একটু বসলে পরে নার্স এসে চা খেয়ে যাবে। সেজ ছেলে বিলেতে। তার আসার কথা ওঠে না। ছোটো মেজ ও বড়ো ঘুমোচ্ছে। এ বাড়ির ছেলেরা বেলা এগারোটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। সেই জন্যই তাদের চাকরি করা হয়ে ওঠেনি। আঠারোখানা দেবত্র বাড়ি আর বাদা অঞ্চলে অসাগর জমি থাকলে কাজ বা করে কে?

শ্বশুরের ঘরে বসে বড়ো বউ ভাবতে চেষ্টা করে শ্বশুর নেই, সে অবস্থাটা কেমন হবে। ক্যানসার, লিভারে ক্যানসার, তা আগে বোঝা যায়নি। বোঝা

গেল যখন, তখন আর কিছু করবার উপায় নেই। বড়ো বউ ভাবতে চেষ্টা করে, তখনও চাঁদ সূর্য উঠবে কি না। শ্বশুর তার কাছে ঠাকুরদেবতার সমান।

তাঁর জন্য দই পেতে ইসবগুল দিয়ে শরবত করে দিতে হত, শত ঠাকুর আসুক, তিনি খেতে আসার পাঁচ মিনিট আগে বড়ো বউকে করতে হত রুটি-লুচি। তাঁর বিছানা পাততে হত, পা টিপতে হত। কত কাজ করতে হত সারা জীবন ধরে। এখন সে সব কি আর করতে হবে না, কে জানে।

ডাক্তাররা বলে দিয়েছে বলেই তো আজ এই যজ্ঞি-হোম হচ্ছে। ছোটো বউয়ের বাবা এক তান্ত্রিক এনেছনে। বেল, ক্যাওড়া, অশ্বত্থ, বট, তেঁতুল গাছের কাঠ এসেছে আধ মণ করে। সেগুলো সব এক মাপে কাটতে হবে। কালো বিড়ালের লোম আনতে গেছে ভজন চাকর। শ্মশান থেকে বালি, এমন কত যে ফরমাশ।

তা ওই লোকটাকে ধরে আনা কাঠ কাটার জন্যে। ও নাকি ক'দিন খায়নি। বাসিনী এনেছে। বাদায় থাকে, অথচ ভাতের আহিংকে এতখানি। এ আবার কি কথা? বাদায় চালের অভাব নাকি? দেখ না একতলায় গিয়ে ডোলে ডোলে কত রকম চাল থরে থরে সাজানো আছে।

নার্স এসে বসে। বড়ো বউ নেমে যায়। আজ খাওয়া-দাওয়া ঝপ্ করে সারতে হবে তান্ত্রিক হোমে বসবার আগে। হোম করে তান্ত্রিক শ্বশুরের প্রাণটুকু ধরে রাখবেন। তান্ত্রিক নীচের হল-ঘরে বসে আছেন।

বড়ো পিসিমা বলেন, নামতে পারলে বাছা? চালগুলো তো বের করে দেবে?

—এই যে দিই।

ঝিঙেশাল চালের ভাত নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে। রামশাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে। বড়োবাবু কনকপানি চাল ছাড়া খান না, মেজ আর ছোটোর জন্য বারোমাস পদ্মজালি চাল রান্না হয়। বামুন চাকর ঝি-দের জন্য মোটা সাপ্টা চাল। বাদার লোকটি কাঠ কাটতে কাটতে চোখ তুলে দেখে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে তার।

— হ্যাঁ। বাসিনী, এত নানানিধি চাল?

— বাবুরা খায়।

— ওই পাঁচ ভাগে ভাত হয়?

— হবে নে? বাদায় এদের এত জমি। চাল এনে পাহাড় করেচে। বড়ো পিসিমা বেচেও দিচ্ছে নুক্কে নুক্কে। আমি বেচতেছি সে চাল।

— বাদায় এদের চাল হয়! তা দে দেকি বাসিনী। এক মুষ্টি চাইল দে। গালে দে জল খাই। বড্ড ঝ্যামন আঁচড় কাটতিছে পেটের মদ্যিখানে। সেই ক'দ্দিন ঘরে আঁদা ভাত খাই না। দে বাসিনী ব্যাগ্যতা করি তোর।

— আরে আরে! কর কি উচ্ছব দাদা। গাঁ সম্পক্কে দাদা তো হও। কেন বা এমন করতেছ। পিসিমা দেকতে পেলে সব্বনাশ হবে। আমি ঠিক তাগেবাগে দে ঝাব। তুমি হাত চালিয়ে নাও দেকি বাবা। এদেরকে বলিহারি ঝাই। এট্টা লোক কদিন খায়নি শুনচ। আগে চাট্টি খেতে দে।

বাসিনী চালগুলি নিয়ে চলে যাবার সময়ে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যায়। লোকটির নাম উৎসব। চিরকালই যে উচ্ছব নাইয়া নামে পরিচিত। গত কয়েকদিন সেই সত্যিই খায়নি। কপালটা মন্দ তার। বড়োই মন্দ। যত দিন রান্না খিচুড়ি দেয়া হচ্ছিল ততদিন সে খেতে পারেনি। অ চন্নুনীর মা। চন্নুনীরে! তোমরা কাড়না ক্যান— কোতা অইলে গো!

বস্তুত এ সব বলে সে যখন খুঁজছিল বউ ছেলে মেয়েকে তখন তার বুদ্ধি হরে গিয়েছিল। একদিন তুমুল ঝড়বৃষ্টি। ছেলে-মেয়েকে জাপটে-সাপটে ধরে বউ কাঁপছিল শীতে আর ভয়ে। সে ঘরের মাঝ-খুঁটি ধরে মাটির দিকে দাবাচ্ছিল। মাঝ-খুঁটিটি মাতাল আনন্দে টলছিল, ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মতো কেঁপেঝেঁকে উঠছিল। উচ্ছব বলে চলেছিল ভগমান! ভগমান! ভগমান! কিন্তু এমন দুর্যোগে ভগবানও কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমোন বোধ করি। ভগমান! ভগমান! উচ্ছব বলছিল। এমন সময়ে মাতলার জল বাতাসের চাবুকে ছটফটিয়ে উঠে এসেছিল। জল উঠল। জল নামল, উচ্ছবদের সংসার মাটিতে লুটোপুটি গেল।

সকাল হতেই বোঝা গিয়েছিল সর্বনাশের বহরখানা। তারপর কয়েকদিন ধরে ঘরের চালের নীচ থেকে কোনো সাড়া পাবার আশায় উচ্ছব পাগল হয়ে থাকে। কে, কোথায়, পাগল নাকি উচ্ছব? সাধন দাশের কথা উচ্ছব নেয় না। সাধন বলে, তোরেও টেনে নেচ্ছল। গাচে বেধে রয়ে গেলি। উচ্ছব

বলে, রা কাড় অ চন্নুনীর মা! ঘরের পাশ ছেড়ে সে নড়তে চায় না। তা ছাড়া টিনের বেশ একটা মুখবন্ধ কৌটো ছিল ঘরে। তার মধ্যে ছিল নির্ভুই উচ্ছবের জমি-চেয়ে দরখাস্তের নকল। উচ্ছব নাইয়া। পিং হরিচরণ নাইয়া। সে কৌটোটা বা কোথায়।

যা আর নেই, যা ঝড়-জল-মাতলার গর্ভে গেছে তাই খুঁজে খুঁজে উচ্ছব পাগল হয়েছিল। তাই রান্না খিচুড়ি তার খাওয়া হয়নি। তারপর যখন তার সম্বিত ফিরল, তখন আর খিচুড়ি নেই। ড্রাইডোল। চালগুলি সে চিবিয়ে জল খেয়েছিল। এভাবে কিছুদিন যায়। তারপর গ্রামের লোকজন বলে, মরেচে যারা তাদের ছরাদ্দ কত্তে হয়। একাজ করার জন্যে তারা মহানাম শতপথিকে খবর দেয়। কিন্তু মহানাম এখন আর দুটো গ্রামে অনুরূপ শ্রাদ্ধশান্তি সেরে তবে এখানে আসবে। গ্রামবাসী অন্যের মাছ-গুগলি-কাঁকড়া যা পাচ্ছে ধরতে লেগেছে। উচ্ছবকে সাধন বলে, তুমি একা কলকেতা যাব বলে নেচেই বা উটলে কেন? সরকার ঘর কত্তে খরচা দেবে শুনছ না?

উচ্ছব হঠাৎ খুব বুদ্ধিমান সাজতে চায় ও বলে, সে এট্টা কতা বটে।

ঝড় জলে কার কি হল, মা-ভাই-বোন আছে না গেছে দেখতে বাসিনী আসতে পারেনি। তার বোন আর ভাজ কলকাতা যাচ্ছিল। ওরা কিছুকাল ঠিকে কাজ করবে। উচ্ছব আগেও গিয়েছিল একবার। বাসিনী যেখানে কাজ করে সে ঘর বাড়ি দেখেছিল বাইরে থেকে। বার-বাড়িতে ঠাকুর দালান আছে, মন্দিরের মাথায় পেতলের ত্রিশূলটা দেখেছিল। বাসিনীর মনিব বাড়িতে হেলা ঢেলা ভাত, এ গল্প গ্রামে সবাই শুনেছে। উচ্ছবের হঠাৎ মনে হয় কলকাতা গিয়ে খেয়ে মেয়ে আসি। কেন মনে হয়েছিল তা সে বলতে পারে না। উপোসে, এক রাতে বউ ছেলে মেয়ে ঘরদোর হারিয়ে সে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিল। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে, কোনো কথা গুছিয়ে ভাবতে পারে না। খুব ভাবে সে, না না। এইবার গুচিয়ে ভাবতে হচ্ছে। কী যে হল তা একনো দিশে হচ্ছে না তেমন। ভাবতে গেলেই তার প্রথমে মনে হয় ধানে গাছ আসার আগেই ধান গাছ থেকে সবুজ রং চলে যেতে থাকে। কার্তিক মাসেই ধান খড় হয়ে গেল। তা দেখে উচ্ছব মাথায় হাত দিয়েছিল। সতীশ মিস্তিরির হরকুল, পাটনাই, মোটা তিন ধানে মড়ক। উচ্ছব তো সতীশের

কাজ করেই ক'মাস বেঁচে থাকে। অ উচ্ছব, মনিবের ধান যায় তো তুই কাঁদিস কেন? কাঁদব না, সাধনবাবু, কাঁদব না? লক্ষ্মী না আসতে সেধে ভাসন যাচ্ছে তা কাঁদব না এতটুকু? আমরা খাব কি?

তা গুছিয়ে চিন্তা করতে বসলে আগে মনে হয় ধানক্ষেতে আগুন লাগার কথা। তারপরই মনে পড়ে যে রাতে ঝড় হয়। সেই সন্ধেয় অনেকদিন বাদে সে পেট ভরে খেয়েছিল। এই এত হিঞ্চে সেদ্দ আর এত গুগলি সেদ্দ নুন আর লঙ্কা পোড়া দিয়ে। দিনটা এমন ছিল যে সেদিন গ্রামের সকল উচ্ছবরা ভরা পেট খেয়েছিল। খেতে খেতে চন্নুনীর মা বলেছিল— দেবতার গতিক ভালো নয়কো। লৌকো নে ঝারা বেইরেচে বুজি বা বোট মারা পরে, এ কথাটাও বেশ মনে পড়ে। তারপরেই মনে পড়ে মাঝ-খুঁটিটা সে মাটির দিকে ঠেলে ধরে আছে। মা বসুমতী ঝেমন সে খুঁটি রাখতে চায়নে, উগরে ফেলে দেবে। ভগমান! ভগমান! ভগমান! তারপর বিদ্যুচ্চমকে ক্ষণিক আলোয় দেখা মাতলার সফেন জল ছুটে আসছে। ব্যাস্, সব খোলামেলা, একাকার তারপর থেকে। কি হল। কোথায় গেল সব, তুমি কোথায়, আমি কোথায়। উচ্ছব নাইয়া। পিং হরিচরণ নাইয়া। কাগজসহ কৌটোটি কোথায়। বড়ো সুন্দর কৌটোখানি গো! চন্নুনীদের যদি রেখে যেত ভগবান, তাহলে উচ্ছবের বুকে শত হাতির বল থাকত আজ। তাহলে সে কৌটো নিয়ে সবাই ভিক্ষেয় বেরোত। সতীশবাবুর নাতি ফুট খায়। উচ্ছব কৌটোটো চেয়ে এনেছিল। অমন কৌটো থাকলে দরকারে একমুঠো ফুটিয়ে নেয়া যায়। চমৎকার কৌটো।

— কী হল, হাত চালাও বাছা। ওদিকে শুষচে কত্তা, হোম হবে, তা কাটগুনো দাঁড়িয়ে দেকচ?

বড়ো পিসিমা খনখনিয়ে ওঠে।

— বড়ো খিদে নেগেচে মা গো!

— এই শোন কতা! ভাত নামলেও খাওয়া নেই একন। তান্ত্রিকের নতুন বিধেন হল, সর্বস্ব রেঁধে রাখো, হোম হলে খেও। তুমি হাত চালাও। উচ্ছব আবার কাঠ কাটতে থাকে। প্রত্যেকটি কাঠ দেড় হাত লম্বা হবে। ধারালো কাটারিটি সে তোলে ও নামায়। ফুটন্ত ভাতের গন্ধ তাকে বড়ো উতলা করে। এদিক ওদিক চেয়ে বাসিনী ঝুড়ি বোঝাই শাক নিয়ে উঠোনে ধুতে আসে।

ঝপ করে একটা ঠোঙা তার হাতে দিয়ে বলে, ছাতু খেয়ে জল খেয়ে এস রাস্তার কল হতে। দেরি ক'রো না মোটে। এ পিশাচের বাড়ি কেমন তা ঝাননি দাদা। গরিবের গতর এরা শস্তা দেকে।

— কে মরতেচে হ্যাঁ বাসিনী?

— তেকেলে বুড়ো। বাড়ির কত্তা। মরবেনে? ওই ঝে হোমের জোগান দিচ্ছে, ওই মুটকি ওনার খাস ঝি। কত্তা মোলে পরে ওকে সাত নাতি না মেরেচি তো আমি বাসিনী নই। তেকেলে বুড়ো মরছে তার ঝন্যি হোম!

ছাতু ক'টি নিয়ে উচ্ছব বেরিয়ে যায়। বাপ রে! এত তরকারি, এত চাল এত মাছ এ একটা যজ্ঞি বটে! সব নাকি বাদার দৌলতে। সে কোন বাদা? উচ্ছবের বাদায় শুধু গুগলি-গেঁড়ি-কচুশাক-শুশনো শাক। উচ্ছব ছাতুটুকু একটু খায়, মিষ্টির দোকানে ভাঁড় চেয়ে নিয়ে জল খায়। ছাতু নাকি পেটে পড়লে ফুলে ফেঁপে ওঠে। তাই হোক। পেটের গভর ভরুক। কিন্তু সাগরে শিশির পড়ে। উচ্ছব টের পায় না কিছু। সে আবার ফিরে আসে।

— কোথা গেছলে?

— এট্টু বাইরে গেলাম মা!

কাঠ কাটলে, হোম হলে ভাত, উচ্ছব তাড়াতাড়ি হাত চালায়। মেজ বউ চেঁচিয়ে বলে, খাবার ঘর মুছেচ বাসিনী? সব রান্না তুলতে হবে।

বাসিনী বলে, মুছিচি!

বড়ো বউ হেঁকে বলে, সব হয়ে গেল?

— মাচের ঘরে সব হল।

এসব কথা শুনে উচ্ছব বুকে বল পায়। ভাত খাবে সে, ভাত। আগে ভাত খাবে, জিবে ভাতের সোয়াদ নেবে। আসার সময়ে গাঁ-জ্ঞেয়াতি বলেছিল, কলকেতা ঝাচ্চ ঝকন, তখন কালীঘাটে ওদের ছরাদ সেরে দিও। অপঘাতে গেচে ওরা ; হ্যাঁ, তাও করবে উছব, মহানাম শতপতি তো এল না। এলে পরে নদীর পাড়ে সারবন্দি ছরাদ হবে। উচ্ছব কালীঘাটে ছরাদ সারবে। সতীশবাবু বলেছে, উচ্ছবের মতিচ্ছন্ন হয়েছে বই তো নয়। বউ ছেলে মেয়ে অপঘাতে মরল, মানুষ পাগল হয়ে যায়। উচ্ছব ভাত ভাত করচে দেখ।

তুমি কি বুঝবে সতীশবাবু! নদীর পাড়েও থাক না, মেটে ঘরেও থাক

না। পাকা ঘর কি ঝড় জলে পড়ে? তোমার ধান চালও পাকা ঘরে রেখেছ। চোর ডাকাতে নেবে না। দেশ জোড়া দুর্যোগেও তোমার ঘরে রান্না হয়। ভাত খেতে দিলে না উচ্ছবকে। তোকে এগলা দিলে চলবে? তাহলেই পালে পালে পঙ্গপাল জুটবে নে? এ হল ভগবানের মার। এর চোট থেকে তোকে বাঁচাতে পারি?— তা তুমি ভাত দিলে না, দেশে ভাত নেই। সেই যে পোকায় ধান নষ্ট, সেই হতেই তো উচ্ছবের আধ-পেটা সিকি-পেটা উপোসের শুরু। পেটে ভাত নেই বলে উচ্ছবও প্রেত হয়ে আছে। ভাত খেলে সে মানুষ হবে। তখন বউ ছেলে মেয়ের জন্যে কাঁদবে। তখনি উচ্ছব প্রেত হয়ে গেছে। মানুষ থাকলে ও ঠিকই বুঝত যে জলের টানে মানুষ ভেসে গেছে। কত গোরু মোষ ভেসে গেল, চন্নুনীর মা তো কোন ছার। উচ্ছব কাঠ কাটা শেষ করে। আড়াই মণ কাঠ কাটলো সে ভাতের হুতাশে। নইলে দেহে ক্ষমতা ছিল না।

পাঁচ ভাগে কাঠ রেখে আসে দালানে। উঠোনে কাঠের কুচো, টুকরো সব ঝুড়িতে তুলে উঠোন ঝাঁট দেয়। তারপর বড়ো পিসিমাকে দেখতে পেয়ে শুধোয়, মা! বাইরে ঝেয়ে বসব?

বড়ো পিসিমা তখনই জবাব দেয় না। কেননা তান্ত্রিক হঠাৎ 'ওঁ হ্রীং ঠং ঠং ভো ভো রোগ শৃণু শৃণু' বলে গর্জে উঠে রোগকে দাঁড় করান, কালো বেড়ালের লোমে রোগকে বেঁধে ফেলেন ও হোম শুরু করেন। একই সঙ্গে ওপর থেকে নার্স নেমে এসে বলে, ডাক্তারকে কল দিন।

— বড়ো মেজ ও ছোটো ঘুম ভাঙা চোখে বিরস মুখে হোমের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, বাসিনী উচ্ছবকে বলে, তুমি ঝেয়ে বাইরে বোস দাদা। না, মন্তর বললে বটে। ঝেমন হাঁকুড় পাড়লে অমনি কত্তা টাল নিলে? কত্তার দেহ থেকে ব্যাদিটা হাঁচোড় পাঁচোড় করে বেইরে এল। চ্যান করবে তো করে নাও কেন?

— একন চান করব নে। মাতায় জল পড়লে পেট মানতে চায়নে মোটে।

বাইরে এসে উচ্ছব শিবমন্দিরের চাতালে বসে। কেমন মন্দির, কেমন চাতাল। বাপরে! এসব নাকি বাদার দৌলতে। সে বাদাটা কোথায় থাকে? ভাত তো খায়নি উচ্ছব অনেক দিন। ভাত খেয়ে দেহে শক্তি পেলে উচ্ছব

সেই বাদাটা খুঁজে বের করবে। উচ্ছবের মত আরো কত লোক আছে দেশে। তাদেরও বলবে।

মন্দিরের চাতালে তাস পেটে তিনটি ছেলে। তারা বলে, বুড়োকে বাঁচিয়ে তুলতে হোম হচ্ছে।

— ফালতু?

— কি ফালতু?

— বেঁচে থেকে ও কত দিন জীবন পাবে? একশো? যত সব ফালতু।

উচ্ছব চোখ বোঁজে। এমন যজ্ঞির পরেও বুড়োকত্তা বেশিদিন বাঁচবে না? কি কাণ্ড! মাতলা নদী যদি সে রাতে পাগল হয়ে মাতাল মাতনে উঠে না আসে তো উচ্ছবের বউ, চন্নুনী, ছোটো খোকা অনেকদিন বাঁচে। উচ্ছবের চোখের জল কোলে গড়ায়। ভাত খাবে আজ। সেই আশাতেই প্রেত উচ্ছব মানুষ হয়ে গেল নাকি? বড়ো ছেলে ছোটো ছেলে খোকার কথা মনে হতে চোখে জল এল হঠাৎ? ভাতই সব। অন্ন লক্ষ্মী, অন্ন লক্ষ্মী, অন্নই লক্ষ্মী, ঠাগমা বলত। ঠাগমা বলত, রন্ন হল মা নক্কী।

— কি হে কানছ কেন?

— আমারে শুদোচ্ছেন বাবু?

— হাঁ হে।

— আবাদ থেকে আসতেছি বাবুগো! ঝড়ে জলে সব নাশ হয়ে, ঘরের মানুষ...

— ও!

তাস পিটানো ছেলেগুলি অস্বস্তিতে পড়ে। বয়স্ক ছেলেটি বলে, ঠিক আছে ভাই ঘুম এসো।

উচ্ছব সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়েই থাকে সে অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ। অবশেষে কার পায়ের ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙে তার।

ইস্! এ যে সাঁঝ বেলা গো। কিন্তু তাকে ঠেলা দিচ্ছে কেন লোকটা?

— ওঠ, ওঠ কে তুমি?

— বাবু... আমি...

— চুরির মতলবে পড়ে আছ?

— না বাবু, এই বাড়িতে কাজ করতেছিলাম।

— ওঠ, ওঠ।

উচ্ছব উঠে পড়ে। তারপর সে অত্যন্ত ঘাবড়ে যায়। রাস্তায় বেশ কয়েকটি গাড়ি। লোকের ছোটো ছোটো জটলা।

— কী হয়েচে বাবু?

কেউই তার কথায় জবাব দেয় না। উচ্ছব বাড়িতে ঢোকে। ঢুকতেই বড়ো পিসিমার বিলাপ শোনে, তোমার ছোটো বেয়াই কি ডাকাতে সন্নেসী আনল গো দাদা! যজ্ঞি হল আর তুমিও মল্লে। অ-দাদা! তুমি যে বিরেশিতে যাবে তা কে জানত বল গো! তোমার আটানব্বই বচর বেঁচে থাকার কথা গো দাদা।

বাসিনীকে দেখতে পায় না উচ্ছব। তবে খুব কর্মব্যস্ততা দেখে। কেত্তন না এলে বেরুনো নেই। কে যেন বলে।

— কেত্তন কি বলছিস বড়ো খোকা। বোনরা, দিদিরা আসুক। বড়ো পিসিমা বলেন। চন্নন বাটছ কেউ?

— খাটের টাকা কে নিয়েছে?

— বাগবাজারে, ফোন করোচো?

— ফর্দটা দেকে দাও দিকি কেউ। খই, ফুল, ধুতি। সব বস্তর...উচ্ছব পাঁচিলের গায়ে সিঁটিয়ে লেপটে দাঁড়িয়ে থাকে। কত যে সময় যায়, কত কী যে হতে থাকে।

মস্ত খাট আসে। রাতে রাতে বের কত্তে হবে। রাতে রাতে কাজ সারতে হবে। নইলে দোষ লাগবে।

অনেক তোড়জোড় হয়। মেয়েরা বসে কাঁদে। হোম যজ্ঞ করেও বুড়ো কত্তার প্রাণটা যে রইল না, তাতে তান্ত্রিককে এতটুকু কুণ্ঠিত দেখা যায় না। তিনি লাইন করে ফেলেন তাঁর। ফলে বড়ো পিসিমা চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, তিন ছেলে হোম ছেড়ে উঠে গেল যে?

এসব কাজে বিঘ্নি পড়লে রক্ষে আছে?— একথার আলোচনায় খুব সরগরম হয় বাড়ি। শোকের কোনো ব্যাপার থাকে না। বাড়ির উনুনই জ্বলবে না। রাস্তার দোকান থেকে চা আসতে থাকে। অবশেষে রাত একটার পর

বুড়ো কত্তা বোম্বাই খাটে শুয়ে নাচতে নাচতে চলে যান। পেশাদারি দক্ষ শববাহকরা আধা দৌড় দেয়। ফলে কীর্তন দলও দৌড়তে বাধ্য হয়। বড়ো পিসিমা বলেন, বাসিনী, সব্বস্ব রান্না পথে ঢেলে দিগে যায়। ঘরদোর মুক্ত কর সব। বউরা যাও না। দাঁড়িয়ে বা রইলে কেন?

উচ্ছবের মাথার মধ্যে যে মেঘ চলছিল তা সরে যায়। সে বুঝতে পারে সব ভাত ওরা পথে ফেলে দিতে যাচ্ছে।

বাসিনী বলে, ধর দেখি দাদা।

— এই যে ধরি!

উচ্ছবের মাথায় এখন বুদ্ধি স্থির, সে জানে সে কী করবে।

— আমাকে দে ভারিটা।

মোটা চালের ভাতের বড়ো ডেকচি নিয়ে সে বলে, দূরে ফেলে দে আসি।

— হ্যাঁ হ্যাঁ লয়তো কুকুরে ছেটাবে, সকালে কাটে ঠোক দেবে— বামুন বলে।

বেরিয়ে এসে উচ্ছব হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে। খানিক হেঁটে সে আধা দৌড় মারে। ভাত, বাদার ভাত তার হাতে এখন। পথে ঢেলে দেবে? কাক-কুকুরে খাবে?

— দাদা।— ত্রস্ত বাসিনী প্রায় ছুটে আসে, অশুচ বাড়ির ভাত খেতে নি দাদা!

— খেতে নি? তুমিও ঝেয়ে বামুন হয়েছ?

— অ দাদা ব্যাগ্যতা করি—

উচ্ছব ফিরে দাঁড়ায়। তার চোখ এখন বাদার কামটের মতো হিংস্র। দাঁতগুলো বের করে সে কামটের মতোই হিংস্র ভঙ্গি করে। বাসিনী থমকে দাঁড়ায়।

উচ্ছব দৌড়তে থাকে। প্রায় এক নিশ্বাসে সে স্টেশনে চলে যায়। বসে ও খাবল খাবল ভাত খায়। ভাতে হাত ঢুকিয়ে দিতে সে স্বর্গ সুখ পায় ভাতের স্পর্শে। চন্নুনীর মা কখনো তাকে এমন সুখ দিতে পারেনি। খেতে খেতে তার যে কি হয়। মুখ ডুবিয়ে দিয়ে খায়। ভাত, শুধু ভাত। বাদার ভাত। বাদার ভাত খেলে তবে তো সে আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন।

আছে, আরেকটা বাদা আছে। সে বাদাটার খোঁজ নির্ঘাত পাবে উচ্ছব। আরো ভাত খেয়ে নি। চন্নুরী রে! তুইও খা, চন্নুরীর মা খাও, ছোটো খোকা খা, আমার মধ্যে বসে তোরাও খা! আঃ! এবার জল খাই, জল! তারপর আরো ভাত। ভোরের ট্রেনে চেইপে বসে সোজা ক্যানিং যাচ্ছি। ভাত পেটে পড়েছে এখন ঝানচি ঝে ক্যানিং হয়ে দেশঘরে যেতে হবে।

উচ্ছব হাড়িটি জাপটে কানায় মাথা ছুঁইয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পেতলের ডেকচি চুরি করার অপরাধে সকালে লোকজন উচ্ছবকে সেখানেই ধরে ফেলে। পেটে ভাতের ভার নিয়ে উচ্ছব ঘুমিয়েছিল, ঘুম তার ভাঙেনি।

মারতে মারতে উচ্ছবকে ওরা থানায় নিয়ে যায়। আসল বাদাটার খোঁজ করা হয় না আর উচ্ছবের। সে বাদাটা বড়ো বাড়িতে থেকে যায় অচল হয়ে।

পাঠবোধ

মানুষের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে খাদ্য। খিদের জ্বালা মানুষকে আর মানুষের পর্যায়ে রাখে না। এ গল্পের মধ্যে দরিদ্রের ক্ষুধার যে জ্বালা প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া আবশ্যক।

শব্দার্থ

বাদা = জলাভূমি
উচ্ছব = উৎসব
চন্নন = চন্দন
মাতলা নদী = মত্ত নদী। পশ্চিমবঙ্গে একটি নদীর নাম।
গেঁড়ি = ছোটো শামুক

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) উচ্ছবের আসল নাম কী?
খ) উচ্ছব কার জমিতে কাজ করত?
গ) কার মঙ্গল কামনায় যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল?
ঘ) বাসিনী লুকিয়ে উচ্ছবকে কী খেতে দিয়েছিল?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)
ক) উচ্ছবের চেহারা ও বেশভূষার বর্ণনা দাও।
খ) উচ্ছবের গ্রামে ভাতের অভাবের কারণ কী ছিল?
গ) "রন্ন হল মা নক্কী"— কার উক্তি? 'রন্ন' ও 'নক্কী' বলতে কী বোঝ?
ঘ) যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কী কী মাছ রান্নার আয়োজন করা হয়েছিল?
ঙ) বড়ো কর্তাদের বাড়িতে প্রতিদিন কী কী চালের ভাত রান্না হত?

৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)
ক) যজ্ঞের ফর্দতে কী কী জিনিসের নাম ছিল?
খ) "কিন্তু সাগরে শিশির পড়ে।"— ব্যাখ্যা করো।
গ) "কলকাতা গিয়ে খেয়ে মেখে আসি।"— কে বলেছে? কলকাতায় গিয়ে তার কী অভিজ্ঞতা হয়েছে লেখো।
ঘ) উচ্ছবের খিদের বর্ণনাই ভাত গল্পের মূল বিষয়।— যুক্তি সহ আলোচনা করো।

মূল্যবোধ শিক্ষা

ড° সুজিত বর্ধন

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য ঃ

মূল্যবোধ শিক্ষা একটি নতুন বিষয়। জ্ঞানকে শুধুমাত্র পুথিগত করে না রেখে ব্যবহারিক জীবনে আত্মশক্তি ও আত্মঅনুশাসনে প্রত্যয়ের সৃষ্টি করা মূল্যবোধ শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য। নিজের সমাজ, সংস্কৃতি ও পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা এর অন্য উদ্দেশ্য। অন্যায়, অবিচার, হিংসা, বিদ্বেষ, মিথ্যাচার ইত্যাদি পরিহার করে সহযোগিতা, সহানুভূতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য এই শিক্ষা উপযুক্ত মানসিকতার সৃষ্টি করে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা সৃষ্টি করা এই শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য। সর্বোপরি, এই শিক্ষা দৃঢ় চরিত্র সৃষ্টির সহায়ক। এ সমস্ত কারণে এবং শিক্ষা বিভাগের নির্দেশক্রমে এই পাঠটি পাঠক্রমে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

লেখক পরিচিতি :

ড. সুজিত বর্ধন বর্তমানে শ্রীমন্ত শংকরদেব ইউনিভার্সিটি অব হেল্‌থ সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠানে ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে কর্মরত। তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণাপত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে।

মূলপাঠ ঃ

মূল্যবোধ শিক্ষা বিষয়টি আমাদের দেশে নতুন নয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। তাই বর্তমান সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যবোধ শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে মূল্যবোধের একটি অতি মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা নৈতিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ শিক্ষা তাই অপরিহার্য।

ইংরাজি Value অর্থাৎ মূল্য শব্দটি মানুষের অন্তর্নিহিত নৈতিক গুণ, বিশেষত্ব, যোগ্যতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বোঝায়। সামাজিকভাবে সমর্থিত যে সব আচরণ, কর্ম বা বিষয়কে গুরুত্ব ও সম্মানের সঙ্গে মানুষ আয়ত্ত করে সেই আচরণ বা কর্মগুলিকে মূল্যবোধ আখ্যা দেওয়া হয়। জীবনের লক্ষ পূরণের স্বার্থে একজন ব্যক্তির মনে কিছু বিশ্বাস বা ধারণার জন্ম হয়। এই বিশ্বাস এবং ধারণার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয় মূল্যবোধ।

সদ্যোজাত শিশু কোনো বোধ নিয়ে জন্ম লাভ করে না। অর্থাৎ মূল্যবোধ কোনো জন্মগত গুণ নয়। অন্য যে কোনো বোধের মত মূল্যবোধও ব্যক্তির নিজের জীবনে আহরণ করা গুণ। একজন ব্যক্তি বা একটি সমাজের জন্য যে সমস্ত গুণ প্রয়োজনীয়, তাৎপর্যপূর্ণ ও মূল্যবান বলে গণ্য করা হয় সেইসব গুণ আহরণ করার জন্য যে প্রচেষ্টা তাকেই মূল্যবোধ শিক্ষা বলা হয়।

শিশু প্রথমত পরিবার এবং পরে বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় মূল্য আহরণ করে। সমাজে বিভিন্ন সময়ে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়ে থাকে। কিন্তু সত্য, নিষ্ঠা, অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, প্রেম, সেবা, ত্যাগ ইত্যাদি গুণগুলি সার্বজনীন তথা বিশ্বজনীন বলে গ্রহণ করা যায়। উপযুক্তভাবে প্রদান করা মূল্যবোধ শিক্ষা ব্যক্তির জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি।

১৯৭৯ সনে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা এবং গবেষণা পরিষদ চুরাশি প্রকার মূল্যবোধের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে। সেগুলির উপর ভিত্তি করে মূল্যবোধকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।

১। **সামাজিক মূল্যবোধ (Social Values) ঃ** সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তিকে সমাজে সঠিক পদক্ষেপে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে এবং সম্মানের সঙ্গে বসবাস করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এই ধরনের সামাজিক মূল্যবোধগুলি হল— সহযোগিতা, বন্ধুত্বভাব, পরোপকার, সহানুভূতি, সংযম, দয়া, ক্ষমা, প্রেম ইত্যাদি। এই ধরনের মূল্যবোধ সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত।

২। **আবেগিক মূল্যবোধ (Emotional Values) ঃ** আবেগিক মূল্যবোধ ব্যক্তিকে সমাজের অন্য লোকের দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদ-আপদে পাশে থাকার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে। আবেগিক মূল্যবোধের জন্যই আমরা সমাজে একে অপরের দুঃখে দুঃখ এবং সুখে সুখ অনুভব করি। অর্থাৎ এই মূল্যবোধের উপরই মানবিক সম্পর্কগুলি টিকে থাকে। সামাজিক বন্ধন অটুট রাখতে এই মূল্যবোধ অত্যন্ত জরুরি।

৩। **নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধ (Aesthetic Values) ঃ** ব্যক্তিভেদে সৌন্দর্যবোধ ভিন্ন। বস্তুত মানসিকতার তারতম্যের উপরই এই মূল্যবোধ নির্ভর করে। সেজন্যই একই জিনিস ভিন্ন জনের কাছে ভিন্নভাবে ধরা দেয়। এই বোধের জন্যই চিত্রকলা, সংগীত, সুকুমার কলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি সৃষ্টির দ্বারা মানুষ আনন্দ লাভ করে।

৪। **আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ (Spiritual Values) ঃ** বিখ্যাত দার্শনিক তথা শিক্ষাবিদ প্লেটোর মতে আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধিই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারতীয় সমাজজীবনে আধ্যাত্মিকতার এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ব্যক্তির আত্মার বিকাশের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। এই মূল্যবোধ অনেকটা ধর্মভাবের সঙ্গে জড়িত।

৫। **নৈতিক মূল্যবোধ (Moral Values) ঃ** সংসারে নিজেকে প্রকৃত মানুষরূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নৈতিক মূল্যবোধ আহরণ করা অতি আবশ্যকীয়। আমাদের সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, পরোপকারিতা, সহযোগিতা ইত্যাদি এই ধরনের মূল্যবোধ।

বর্তমান যুগে মূল্যবোধ শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কারণ বর্তমান অবক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থায় নানা ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। আমাদের সমাজ অন্যায়-অবিচার, হিংসা, বিদ্বেষ, নির্যাতন, অত্যাচার, শোষণ এবং অপরাধে ভরে গেছে। সমাজের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার্থীদের মনে মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য কিছু নির্দিষ্ট আদর্শ স্থির করা অতি প্রয়োজন। বর্তমান গতিশীল সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা সামাজিক ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ করে সেই অনুসারে নিজের কর্ম করার জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করে তুলতে হবে। আজকের আধুনিক সমাজে সাধুতা, দয়া, সহানুভূতি, প্রেম, ক্ষমা, মৈত্রী, ন্যায়, অহিংসা, পরোপকার, সংযম, সহিষ্ণুতা, পবিত্রতা, সহযোগিতা ইত্যাদি মানবিক গুণগুলি অতীতের স্মৃতি হয়ে পড়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলি শিক্ষার্থীদের অন্তরে পুনরায় জাগ্রত করতে হলে মূল্যবোধ শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন। আজকের তরুণ-তরুণীরাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। অতএব তাদের সংকীর্ণ মনোভাব দূর করে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সব সমস্যা সমাধানের জন্য উৎসাহিত করা অতি প্রয়োজন। আমাদের দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পরম্পরা ইত্যাদির প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর এক শ্রদ্ধাশীল মনোভাব জাগ্রত করতে হবে। দেশের বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা নির্বিশেষে সকলের মনে সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি করা প্রয়োজন। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্যই আজকের প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে শিষ্টাচারের অভাব, অপরাধ প্রবণতা, অশালীন আচরণ এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় মূল্যবোধ শিক্ষার প্রসার ঘটানো। কেননা একমাত্র মূল্যবোধ শিক্ষাই এই কাজ সম্ভব করতে পারে। অতএব শিক্ষানুষ্ঠানগুলিতে মূল্যবোধ শিক্ষা আবশ্যক করা অত্যন্ত জরুরি।

শব্দার্থ-টীকা ঃ

অন্তর্নিহিত — ভিতরে রয়েছে এমন।
তাৎপর্য — অর্থ, মর্ম, অভিপ্রায়।
ভাস্কর্য — মূর্তিশিল্প, খোদাইয়ের কাজ, (Sculpture)।
মৈত্রী — মিত্রতা, সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব।

শিক্ষকের প্রতি ঃ

- প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ বহু জাতির মিলনভূমি। সেজন্যই ভারতীয় সংস্কৃতি এত ঋদ্ধ। এবিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিস্তৃত ভাবে বলা যেতে পারে।
- মূল্যবোধ শিক্ষা আমাদের জীবনে এবং সমাজে কী উপকার সাধন করে এ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা যেতে পারে।
- কেবলমাত্র পুথিগত বিদ্যা বা আলোচনার মধ্যে এ ধরনের শিক্ষাকে বদ্ধ না রেখে বিভিন্ন গণমাধ্যমের যেমন— ছায়াছবি, নাট্যানুষ্ঠান, রেডিও ইত্যাদির সাহায্য নিলে শিক্ষার্থীদের তা গ্রহণে সুবিধা হবে।
- এছাড়া এন.সি.সি., এন.এস.এস. ইত্যাদি সংগঠনগুলি দ্বারা আয়োজিত কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করলে দলীয় আনুগত্য, নিঃস্বার্থ সেবা, জাতীয় চেতনা, জাতীয় সংহতি ইত্যাদি মনোভাব বৃদ্ধি লাভ করবে।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) মূল্যবোধ শিক্ষা পাঠটির লেখক কে?

খ) মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ?

গ) মূল্যবোধ কোনো —— গুণ নয়। (শূন্যস্থান পূর্ণ করো)

ঘ) কত সালে জাতীয় শিক্ষা এবং গবেষণা পরিষদ চুরাশি প্রকার মূল্যবোধের তালিকা প্রস্তুত করেছে?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) মূল্যবোধ কীভাবে আহরণ করা যায়?

খ) টীকা লেখো : সামাজিক মূল্যবোধ, আবেগিক মূল্যবোধ, নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ।

৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) পাঠে উল্লিখিত যে কোনো দুটি মূল্যবোধ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখো।

খ) মূল্যবোধ শিক্ষা আমাদের কী প্রয়োজন সাধন করে? বিস্তারিত লেখো।

গ) মূল্যবোধ শিক্ষা কি তোমার আবশ্যিক বলে মনে হয়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

কৈশোরকাল ও তার উপযোগী শিক্ষা

ড° কাবেরী সাহা

❑ পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য ঃ

সমস্ত জীবজগতের বৃদ্ধি ও বিকাশ এক স্বতঃস্ফূর্ত অন্তহীন ধারা। মানবজীবন এর ব্যতিক্রম নয়। একটি শিশু বেড়ে ওঠে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে। বাল্যকাল ও প্রাপ্তবয়স্কের মাঝের সময় হল কৈশোর কালের সময়সীমা। ব্যক্তি জীবনের জটিলতাপূর্ণ কৈশোর কালের কথা চিন্তা করে এই পাঠটি পাঠক্রমে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

❑ লেখক পরিচিতি ঃ

১৯৬৩ সালে শিলং শহরে লেখিকার জন্ম হয়। লেখিকা বর্তমানে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। কিছুদিন ডিফু সরকারি মহাবিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়, আন্তঃরাষ্ট্রীয় পত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

❑ মূলপাঠ ঃ

কৈশোর কাল অর্থাৎ যৌবনকাল (adolescence) শব্দটি ল্যাটিন Adolesure (এডলোসিয়ার) শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হল যৌবনোত্তর কালের প্রথম স্তর। একটি শিশু জন্মগ্রহণ করবার পর বড় হয়ে উঠে বিভিন্নস্তরের মধ্য দিয়ে। প্রথম অবস্থায় শিশুটি থাকে অতি অসহায়, অপরিণত অবস্থায়। কিন্তু আমরা যদি লক্ষ করি তবে দেখব, এই শিশু জন্মলগ্ন থেকেই অতি দ্রুতগতিতে বিকাশের পথে অগ্রসর হতে থাকে। জীবনব্যাপী চলা শিশুর

বিকাশের ধারাকে রুশো কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছিলেন— (১) শৈশব কাল (জন্ম থেকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত) ; (২) বাল্যকাল (পাঁচ থেকে বারো বৎসর পর্যন্ত) ; (৩) যৌবন কাল বা কৈশোর কাল (বারো থেকে আঠারো বৎসর পর্যন্ত) এবং (৪) যৌবনোত্তর কাল (আঠারো বৎসরের পর)।

কৈশোর হল শিশুবিকাশের তৃতীয় স্তর। সহজ সুন্দর শৈশব কালের বিপরীতে একটি কিশোর এইসময় বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হয়। এইসময়ে তাদের আচরণ কখনো শিশুদের মতো, কখনও বা প্রাপ্তবয়স্কের মতো হয়। সেইজন্য শিশুর জগত ও প্রাপ্তবয়স্কের জগতের সন্ধিক্ষণকে বয়ঃসন্ধি কাল বা কৈশোর কাল বলা হয়েছে। কৈশোরের জগতে শৈশবের কল্পনা এবং প্রাপ্তবয়স্কের বাস্তব উপলব্ধি দুই-ই পরিলক্ষিত হয়। ষ্টেনলি হলের মতে এই সময়টি জীবনের জটিলতম এবং সংকটপূর্ণ সময়।

মানবজীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ কাল হিসাবে চিহ্নিত কৈশোর বা বয়ঃসন্ধি কালের বহু বৈশিষ্ট্য অন্যান্য স্তরে দেখা যায় না। মনোবৈজ্ঞানিকেরা কৈশোর কালের যে সময়সীমা (এগারো-বারো বৎসর থেকে আঠারো-উনিশ বৎসর পর্যন্ত) চিহ্নিত করেছেন এরও ব্যতিক্রম দেখা যায় লিঙ্গ-ভেদে, ব্যক্তিভেদে বা জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে। উপরিউক্ত কারণের ফলে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের, শীতের দেশের শিশু থেকে গরম জলবায়ুর দেশের শিশুদের কৈশোর অবস্থা প্রাপ্তি কিছু আগে ঘটে।

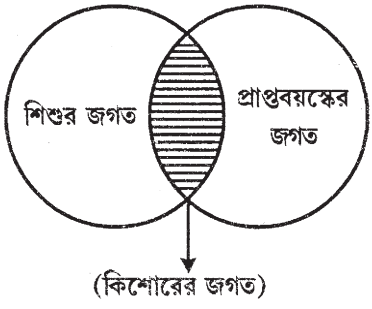

কিশোর কিশোরীদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করার আগে তাদের মধ্যে সাধারণত পরিলক্ষিত হওয়া পরিবর্তনের বিষয়ে আমাদের

স্পষ্ট ধারণা থাকা অতি প্রয়োজন। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অবস্থায় জৈবিক, মানসিক, আবেগিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রের পরিপক্কতার কথা বোঝায়। এই অবস্থায় শারীরিক বা জৈবিক পরিবর্তনগুলি যেমন স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় ঠিক সেইভাবে মানসিক বা সামাজিক গুণগুলির বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না।

কৈশোর কালের বিকাশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলি সম্বন্ধে এমনকী অভিভাবকদেরও অবহিত হওয়া খুবই প্রয়োজন।

শারীরিক বিকাশ ঃ কৈশোর কালের শারীরিক বিকাশ লক্ষণীয় বিষয়। এইসময় শরীরের নানাধরণের পরিবর্তন ঘটে। তাদের দেহের আকার, ওজন, দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি, গলার স্বরের পরিবর্তনের সঙ্গে নারী-পুরুষের দেহ গঠনের পার্থক্য দেখা যায়। প্রজনন ক্ষমতার প্রাপ্তি কিশোর কালের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই সমস্ত অভাবনীয় পরিবর্তন কিশোর-কিশোরীদের মনে আত্মচেতনার ভাব জাগ্রত করে। যার ফলে তাদের মনে অহেতুক লজ্জা, ভয় বা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। বিপরীত লিঙ্গকামিতা কৈশোর কালের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফ্রয়েডের মতে যৌন চেতনা বয়ঃসন্ধির মূল প্রেরণা। আসলে এই সময় দেহের অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির নিঃসরণ হয়। ফলে দেহের মধ্যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন দেখা দেয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে কিশোর-কিশোরী অফুরন্ত যৌবনের অধিকারী হয়ে উঠে। এই সময় তাদের সুপথে পরিচালিত করতে পারলে কৈশোর কালে দেখা দেওয়া বহু সমস্যার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

বৌদ্ধিক বিকাশ ঃ শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৈশোর অবস্থায় দ্রুত মানসিক বিকাশ ঘটে। মস্তিকের গঠন প্রক্রিয়া পূর্ণতা পাওয়ার ফলে উচ্চস্তরীয় জ্ঞান ও দক্ষতামূলক শিক্ষালাভের জন্য তারা উপযুক্ত হয়ে উঠে। বিমূর্ত চিন্তা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইকালে কিশোর-কিশোরীদের বিশ্লেষণাত্মক এবং সংশ্লেষণাত্মক শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এর ফলে তারা স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাধারার শক্তি অর্জন করে।

আবেগিক বিকাশ ঃ দেহের আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে তাদের মনোজগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আবেগ প্রবণতার ফলে কিশোর-কিশোরীরা অনেকসময় অতি আশাবাদী বা নিরাশাবাদী হয়ে পড়ে। অনেকের মধ্যে একাকীত্বের ভাব লক্ষ করা যায় বা অনেকে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠে। এইসময় উপযুক্ত প্রণালীবদ্ধ শিক্ষা দিতে না পারলে তারা বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে নানাধরণের জটিল অবস্থার সম্মুখীন হয়। সমাজের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব থেকে সৃষ্টি হয় অপরাধ প্রবণতা। সুস্থভাবে এই আবেগকে প্রশিক্ষিত করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে এই কিশোর-কিশোরীরা সুস্থ সমাজগঠনে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে।

সামাজিক বিকাশ ঃ কৈশোর কালে সামাজিক বিকাশ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক সংঘবদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সহমর্মিতার ভাব এই স্তরে প্রবলভাবে জেগে উঠে। সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ভাব গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হয় প্রতিযোগিতার মনোভাব। এর থেকে জন্ম নেয় কিশোর সংস্কৃতি নামে এক উপসংস্কৃতির। চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাকভঙ্গী, ধ্যান-ধারণা, বিভিন্ন মতাদর্শের ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই বয়সে যেকোনো আদর্শকে সামনে রেখে কোনো অনুষ্ঠান বা সংঘের কাজ করে সমাজে স্বীকৃতি বা প্রশংসা লাভ করার চেষ্টা করে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করে। এই সময়ে তারা অপসংস্কৃতির দিকে সহজেই ধাবমান হয়। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি সম্পর্কে তাদের সচেতন ও সুশিক্ষিত করা না গেলে বিপথগামী হওয়ার ভয় থাকে।

নৈতিক বিকাশ ঃ কৈশোর কালে মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের বিচার ক্ষমতা গড়ে উঠে। এর ফলে নৈতিক ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে তার প্রভাব পড়ে। ধর্মের প্রতি, দর্শনের প্রতি বা জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের জিজ্ঞাসা জাগ্রত হবার ফলে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে। অনেক সময় প্রচলিত আদর্শ ত্যাগ করে নিজ বিবেচনা অনুসারে নৈতিকতা সমৃদ্ধ নতুন

সমাজ গড়ার চেষ্টা করে। সামাজিক ও রাজনৈতিকভারে সচেতন হয়ে উঠে। গড়ে উঠে নিঃস্বার্থ মনোভার। নৈতিকতার এই মনোভাব থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতা, দেশপ্রেম বা বিশ্বপ্রেম আদি ভাবের জন্ম হয়। বিশ্বের বহু সামাজিক বিপ্লবের অংশ গ্রহণকারী মানুষের অধিকাংশেই কিশোর-কিশোরী। কৈশোর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সমস্ত গুণাবলি লক্ষণীয়, কারণ বিকাশের অন্যান্য স্তরে এইধরনের মনোভাব সামূহিকভাবে দেখা যায় না। এই স্তরেই জন্ম হয় পরানুভূতির।

আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মসন্মানবোধ ও নিজস্বতার সংঘাত ঃ কৈশোর অবস্থাতেই তারা হয়ে উঠে আত্মনির্ভরশীল। অন্যের উপর নির্ভর না করে এ সময় নিজের শক্তি-সামর্থে আস্থা রেখে নিজের কাজ করতে পছন্দ করে। এই আত্মসন্মানবোধের প্রাবল্য কোনো ধরনের কটু সমালোচনা ছেলে-মেয়েরা সহ্য করতে পারেনা, বাধা-নিষেধের সন্মুখীন হলে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। এই স্তরে নিজস্বতার সংখাতে ভুগতে দেখা যায়। এই সংখাত এদের মনে জেগে উঠে বিপরীত ভাবাপন্ন অনুভূতির ফলে। কৈশোর কালে আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তবতার সংঘাত ঘটে এবং তার থেকে জন্ম হয় নিজস্বতার সংঘাত। সমাজ গঠনে এই ধরনেৰ সংঘাত তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করে। শক্তিশালী সংঘাতে সমাজের ভিত পরিবর্তন করে তারা নতুন সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

বীর পূজাৰ প্রবৃত্তি এই বয়সের একটি লক্ষণ বলা যেতে পারে। যাকে ভালো লাগে তাকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার প্রবণতা এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দেখা যায়।

শারীরিক, মানসিক বিকাশের বাইরেও আরো কিছু বৈশিষ্ট্য এই বয়সে দেখা যায়, যেমন দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনা। কাল্পনিক শক্তির অতিমাত্রায় বিকাশের ফলে তারা কল্পনার মোহজালে আবদ্ধ হয়ে বাস্তব জগত থেকে সৰে গিয়ে অবাস্তবের জগতে ভেসে বেড়ায়। তার সৃষ্টিশীল কর্মেৰ জন্য কল্পনাও প্রয়োজন আছে। এই অৰস্থায় অনেকেৰ মনে ভ্রমণ ও দুঃসাহসিক

কর্মের স্পৃহা জেগে উঠে। আবার অনেকে বাড়ির অজ্ঞাতে অজানার উদ্দেশে পাড়ি দৃষ্টান্ত দেওয়ারও দৃষ্টান্ত ও দেখা যায়।

কৈশোরকালের পরিবর্তন ও বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা থেকে বলা যায় এই সময়টাকে জীবনের জটিলতম সময় বলে চিহ্নিত করা যুক্তিসংগত।

কৈশোর কালের উপযোগী শিক্ষা ঃ এই সময় সীমার ছেলে মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৯৫২-৫৩ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে তিনটি বিষেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিল। সেগুলো হল— (১) দেশের সমসাময়িক, রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার পটভূমিতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদাপূরণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা ; (২) ধর্ম নিরপেক্ষ দেশের সুনাগরিক হিসাবে প্রয়োজনীয় গুণাবলি আয়ত্ত করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সহায়তা করা ; (৩) জাতীয় সংহতির বিকাশ সাধন করা।

ভারত সরকার ঘোষিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার জন্য কিছু সুপারিশ করেছিল। এর মধ্যে প্রধান দুটো হল— (১) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর একটি উপযুক্ত স্তর যেখানে ছেলে মেয়েদের কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিভাগের উপযোগিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করা সম্ভব, যার ফলে ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিভাগ বেছে নিতে পারে।

(২) এই স্তরেই ছাত্র-ছাত্রীদের দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জাতীয় সংহতি, দেশের প্রতি দায়িত্ব্য, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করবার জন্য ব্যবস্থা করে দেশের জনশক্তিকে অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়াস করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও আন্তঃরাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ (১৯৯৬) মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবনের সন্ধিক্ষণ (crossroad of life) বলে অভিহিত করেছে। কারণ এই স্তরেই ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ব করে নিজ নিজ যোগ্যতা বা রুচি অনুযায়ী জীবনের

পথে অগ্রসর হতে পারে। কেননা শিক্ষাই হল সমাজ পরিবর্তন করার এক শক্তিশালী মাধ্যম।

এক কথায় বলা চলে, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এই স্তরে কোনোধরনের বিশেষীকরণ (specialisation) পাঠক্রম নেই। সেই জন্য নানাধরনের সহপাঠ্য ক্রমিক বিষয়গুলির মধ্য দিয়ে কিশোর কিশোরীদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক, আবেগিক ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

এইসময় কৈশোর মনে সৃষ্টি হওয়া আলোড়নের পরিপ্রেক্ষিতে নানাধরনের চাহিদার উদ্ভব হয়। তাই এই আয়োগ বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষানুষ্ঠানের বিভিন্নতা, অপর্যাপ্ত ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি, বিদ্যালয় ও পরিবারের মধ্যে যোগসূত্র, বিদ্যালয় ও বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদিতে গুরুত্ব দেয়। সুপরিকল্পিত মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতিই কৈশোরের বিভিন্নমুখী চাহিদাগুলি পূরণ করতে সফল হতে পারে। সহপাঠক্রম (co-curricular) বিষয়কে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া অতি প্রয়োজন। এইক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদের প্রস্তুত করা জাতীয় পাঠক্রমের ধারার ২০০৫ সালের পরামর্শাবলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

শব্দার্থ-টীকা ঃ

অভাবনীয় — অপ্রত্যাশিত ; অচিন্তনীয়।

মনোবিজ্ঞান — মনের প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, Psychology.

দিবাস্বপ্ন — অলীক কল্পনা।

বিমূর্ত — মূর্তিহীন ; ভাবমূলক।

পরানুভূতি — অন্যের জন্য অনুভব বা আত্ম ত্যাগ করা।

সন্ধিক্ষণ — সংযোগ কাল ; এক কালের অবসান ও অন্য কালের আরম্ভের সময়।

পাঠবোধ ঃ

শৈশবকালের সহজ-সরল জীবনধারার বিপরীতে কৈশোর কালের ছেলে-মেয়েরা দৈহিক, মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে সম্মুখীন হয় নানা জটিল পরিবর্তনের। এই সময়ের অতিদ্রুত বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ করে মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাপরিষদ অনুকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার মত পোষণ করেন। জাতীয় পাঠক্রম পরিকাঠামো (National Curricular Frame Work 2005) ২০০৫ এর পরামর্শাবলি মেনে নিয়ে এই স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া এবং সেই সঙ্গে শিক্ষক ও পিতা-মাতা এদের প্রণালীবদ্ধ উপায়ে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলতে সাহায্য করা উচিত।

শিক্ষকের প্রতি ঃ

- উপরোক্ত জাতীয় পাঠক্রমের ধারা অনুযায়ী বিদ্যালয়ে প্রদত্ত পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগতের (Real life) প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা অতি প্রয়োজন। পুথিগত জ্ঞানের পরিধি ছাড়িয়ে একটি সুসংহত জ্ঞানের বিকাশের দায়িত্ব কেবলমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নয়, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত যেমন পিতা-মাতা, অভিভাবক ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সহায়তা অবশ্য প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ।

- কৈশোর জন্য প্রস্তুত করা মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে সন্নিবিষ্ট করা চারটি প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয় হল— (১) ভাষাশিক্ষা, (২) গণিত, (৩) বিজ্ঞান ও (৪) সমাজ-বিজ্ঞান। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়, কারিগরি বিদ্যা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, পরিবেশবিজ্ঞান শিক্ষা, যৌনশিক্ষা এবং জনশিক্ষা, মানব অধিকার ও শান্তির শিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে কিশোর-কিশোরীদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক সম্পর্কীয় চাহিদাগুলির সামগ্রিক বিকাশ সাধন হবে বলে ভাবা হয়েছে।
- আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে, বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যার জয়যাত্রার যুগে, মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুথিগত করে রাখা কোনো মতেই সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভূত উন্নতির ফলে জনসংযোগের বিভিন্ন মাধ্যম যেমন দূরদর্শন, ইন্টারনেট, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পূর্ণ পৃথিবী একটি ছোটোগ্রামে (Global Village) এ পরিণত হয়েছে। জনসংযোগের বিভিন্ন মাধ্যম, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু মানসিকভাবে সম্পূর্ণ উপযুক্ত না হওয়া কৈশোরকালের ছেলে-মেয়েদের আবেগের বশবর্তী হয়ে সময়ের স্রোতে ভেসে যেতে দেখা যায়। এরফলে যুবসমাজ বিপথে পরিচালিত হয়। বিজ্ঞান যেমন একদিকে আশীর্বাদ অন্যদিকে অভিশাপ— এই জ্ঞান কিশোর-কিশোরীদের দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এইক্ষেত্রে মূল্যবোধের শিক্ষা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সংঘাত পূর্ণ কৈশোরকালের কিশোর-কিশোরীদের সুযোগ্য, সফল ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে আমাদের প্রয়োজন এক আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি— যেখানে থাকবে বৌদ্ধিক দক্ষতাবৃদ্ধি ও অনুভবশীলতা সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, একটি সুসংগঠিত, শান্তিপ্রিয় ও সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার বিশ্বাস।

বাংলা সাহিত্য চয়নিকা

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) কৈশোরকাল ও তার উপযোগী শিক্ষা পাঠটির লেখক কে?

খ) কৈশোরকাল কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত?

গ) কৈশোরকাল শিশু বিকাশের কোন স্তর?

ঘ) কত সালে ভারত সরকার জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে নতুন করে সাজাবার জন্য সুপারিশ করেছিল?

ঙ) আন্তঃরাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ কোন শিক্ষাকে 'জীবনের সন্ধিক্ষণ' বলে অভিহিত করেছে?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) রুশো শিশু-বিকাশের ধারাকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছিলেন? সেগুলো কী কী?

খ) স্ট্যানলি হল কৈশোরকালকে জীবনের জটিলতম এবং সংকটপূর্ণ সময় বলে মনে করেন কেন?

গ) মনোবিজ্ঞানীরা কৈশোরকালের সময়সীমা কীভাবে ভাগ করেছেন?

৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) কৈশোরকালের যে কোনো দুটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

খ) জীবনের কোন সময়কে কৈশোরকাল বলা হয়? এই বয়সের সময়সীমা উল্লেখ করে বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

গ) কী ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা কৈশোরকালের উপযোগী? উদাহরণ সহকারে বর্ণনা করো।

ঘ) ''আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মসম্মানবোধ ও নিজস্বতার সংঘাত'' কৈশোরকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য— আলোচনা করো।

ব্যাকরণ

১। প্রবাদ-প্রবচনগুলির নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করো। অন্যান্য ভাষার মতো বাংলাভাষাও নানা প্রবাদ-প্রবচন এবং বাগ্বিধি-বাগ্‌ধারা দ্বারা সমৃদ্ধ। আবহমান কাল থেকে এগুলি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে এসেছে। এগুলি মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানপ্রসূত সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ভাবপ্রকাশক উক্তি। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ; অতি দর্পে হত লঙ্কা ; শাক দিয়ে মাছ ঢাকা; অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ; নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা ; অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ; চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি ; শূন্য কলসির শব্দ বেশি; টাকা চাই দেবে গৌরী সেন ইত্যাদি।

২। **বাগ্বিধি-বাগ্‌ধারার অর্থ লেখো ও বাক্য রচনা করো—**

খয়ের খাঁ ; গৌরচন্দ্রিকা ; আক্কেলসেলামি ; ব্যাঙের সর্দি ; শাঁখের করাত; অমাবস্যার চাঁদ ; ডুমুরের ফুল ; কলুর বলদ ; চিনির বলদ ; তালপাতার সেপাই ; হ-য-ব-র-ল ; গোবর গণেশ ; আক্কেল গুড়ুম ; ইঁচড়ে পাকা ; হাতটান ; পুকুর চুরি ইত্যাদি।

৩। **প্রতিশব্দ লেখো—**

আকাশ ; আগুন ; জল ; পৃথিবী ; পদ্ম ; রাজা ; দিন ; রাত্রি ; সাপ; পাখি; নদী ; গৃহ ইত্যাদি।

৪। **সমাস**

পরস্পর অর্থ-সম্পর্কযুক্ত দুই বা দুইয়ের বেশি পদের একপদে পরিণত হওয়ার নাম সমাস। যেমন গাছে পাকা = গাছপাকা। নীল যে উৎপল = নীলোৎপল।

যেসব পদের মিলনে সমাস হয়, তাদের বলা হয় সমস্যমান পদ। এখানে 'গাছে' ও 'পাকা', 'নীল' ও 'উৎপল' পদগুলি সমস্যমান পদ।

সমস্যমান পদগুলি মিলিত হয়ে যে পদ গঠিত হয় তাকে বলা হয় সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ। 'গাছপাকা', 'নীলোৎপল' পদগুলি সমস্ত পদ।

সমাসবদ্ধ পদটিকে বিশ্লেষণ করবার জন্য যে বাক্যের প্রয়োজন হয়, তাকে বলা হয় ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য। গাছে পাকা কিংবা নীল যে উৎপল এই বাক্যগুলি ব্যাস-বাক্য বা বিগ্রহ বাক্য।

সমস্যমান পদগুলির প্রথম পদটিকে 'পূর্বপদ' এবং পরবর্তী পদটিকে বা পদগুলিকে 'উত্তরপদ' বা 'পরপদ' বলা হয়। এখানে 'গাছে' এবং 'নীল' পূর্বপদ। 'পাকা' এবং 'যে উৎপল' পরপদ।

সমাসের প্রকার ভেদ : সমাস প্রধানত ছয় প্রকার— দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব, কর্মধারয়, দ্বিগু ও বহুব্রীহি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সমাস মূলত তিন প্রকার। (১) সংযোগমূলক— দ্বন্দ্ব (২) বর্ণনামূলক— বহুব্রীহি এবং (৩) ব্যাখ্যানমূলক— তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

১। দ্বন্দ্ব সমাস : যে সমাসে দুই বা তার অধিক পদের মিলন হয় এবং সমস্যামান প্রতিটি পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। সাধারণভাবে সমস্যমান পদগুলিকে সংযোজক অব্যয় যুক্ত করে। যেমন হর ও গৌরী = হরগৌরী, জায়া ও পতি = দম্পতি, মশা ও মাছি = মশামাছি।

দ্বন্দ্ব সমাসকে বেশ কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়। তার মধ্যে বিশেষ দুটি শ্রেণির নাম হল— একশেষ দ্বন্দ্ব এবং অলুক্ দ্বন্দ্ব।

ক) একশেষ দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুটি বা তার বেশি পদ মিলে যখন একটি পদে পরিণত হয় তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। যেমন— তুমি, আমি ও সে = আমরা, রাম ও শ্যাম দুই ভাই = রামেরা।

খ) অলুক্ দ্বন্দ্ব : অ (অর্থাৎ না) লুক (অর্থাৎ লোপ) কথাটির অর্থ বিভক্তির চিহ্নলোপ না হওয়া।

যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তির চিহ্ন লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব-সমাস বলে।

যেমন মাঠে ও ময়দানে = মাঠেময়দানে।
কাগজে ও কলমে = কাগজেকলমে।

২। তৎপুরুষ সমাস : যে সমাসে পূর্বপদের কারক বা সম্বন্ধবোধক বিভক্তি লুপ্ত হয়ে পরপদের অর্থই প্রধান হয়ে ওঠে, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ ও শ্রেণিবিভাগ করা হয়। যেমন— দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি।

এ ছাড়া নঞ্ তৎপুরুষ, অলুক্ তৎপুরুষ প্রভৃতি সমাসও তৎপুরুষ সমাসেরই অন্তর্ভুক্ত।

যেমন :

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ— শরণকে আগত = শরণাগত।
দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = দীর্ঘস্থায়ী।
তৃতীয়া তৎপুরুষ— বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত = বিজ্ঞানসম্মত।
চতুর্থী তৎপুরুষ— বালিকাদের নিমিত্ত বিদ্যালয় = বালিকা বিদ্যালয়।
পঞ্চমী তৎপুরুষ— কারা হইতে মুক্ত = কারামুক্ত।
সর্প হইতে ভয় = সর্পভয়।
ষষ্ঠী তৎপুরুষ— ছাত্রের সমাজ = ছাত্রসমাজ।
পথের রাজা = রাজপথ।
সপ্তমী তৎপুরুষ— জলে মগ্ন = জলমগ্ন।
শিল্পে পটু = শিল্পপটু।

ক) নঞ্ তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদ নঞর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয়, তাকে নঞ-তৎপুরুষ সমাস বলে। সংস্কৃত 'নঞ্' অব্যয়ের বাংলা প্রতিরূপ অ, অন্, অনা, আ, গর্, ন, না, বি ও বে। এখানে যেমন হয়েছে, অ— নেই মিল = অমিল, বি— নয় দেশ = বিদেশ, বে— নয় গতিক = বেগতিক ইত্যাদি।

খ) অলুক্ তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির চিহ্ন লোপ হয় না, তাকে অলুক্ তৎপুরুষ সমাস বলে।

যেমন :

চোখে দেখা = চোখে দেখা।
পেটের (জন্য) ভাত = পেটেরভাত।
মনের মানুষ = মনের মানুষ।
কলেজে পড়া = কলেজে পড়া ইত্যাদি।

৩। অব্যয়ীভাব সমাস : যে সমাসে একটি পদ অব্যয় এবং সমাসবদ্ধ হওয়ার পর অব্যয়টির অর্থই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় তাকে অব্যয়ভীব সমাস বলে। সামীপ্য, ব্যাপ্তি, সাদৃশ্য, পশ্চাৎ, অনতিক্রম, যোগ্যতা, সীমা প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

উদাহরণ—

কূলের সমীপ = উপকূল।
ক্ষণে ক্ষণে = অনুক্ষণ/প্রতিক্ষণ।

ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ।
প্রেরণার যোগ্য = অনুপ্রেরণা।
শৈশব থেকে = আশৈশব।
বছর বছর = ফি-বছর।

৪। কর্মধারয় সমাস : যে সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ যথাক্রমে বিশেষণে ও বিশেষ্যে বা বিশেষ্যে ও বিশেষণে বা বিশেষণে ও বিশেষণে গঠিত হয় তবে তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। কর্মধারয় সমাস মূলত তৎপুরুষ সমাসেরই প্রকারভেদ মাত্র।

যেমন :

মহৎ যে জন = মহাজন (বিশেষণ ও বিশেষ্য)
নব যে অন্ন = নবান্ন
যে খোকা সেই বাবু = খোকাবাবু (বিশেষ্য ও বিশেষণ)
যিনি পিতা তিনিই ঠাকুর = পিতাঠাকুর।
যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর (বিশেষণ ও বিশেষণ)
ভীষণও যে মধুর সে = ভীষণমধুর।

গঠন প্রকৃতির পার্থক্য অনুযায়ী কর্মধারয় সমাসকে আবার কয়েকটি পৃথক সমাসে বিভক্ত করা হয়েছে। সেগুলি হল মধ্যপদলোপী, উপমান, উপমিত ও রূপক।

ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাস-বাক্যের মধ্যস্থিত ব্যাখ্যানমূলক পদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

যেমন :

সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।
পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন।

এখানে ব্যাস-বাক্যের অন্তর্ভুক্ত 'চিহ্নিত' ও 'মিশ্রিত' পদগুলি লোপ পেয়েছে।

খ) উপমান কর্মধারয় : উপমান (যার সঙ্গে তুলনা করা হয়) পদের সঙ্গে সাধারণ ধর্মবাচক শব্দের যে সমা হয়, তাকে বলা হয় উপমান কর্মধারয়।

যেমন : নিমের মতো তিতা = নিমতিতা, বকের ন্যায় ধার্মিক = বকধার্মিক, কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল।

গ) উপমিত কর্মধারয় : উপমান (যার সঙ্গে তুলনা করা হয়) পদের সঙ্গে উপমেয় (যার তুলনা করা হয়) পদের যে সমাস হয়। তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলা হয়। যেমন— কমলের মতো চরণ = চরণকমল, চাঁদের মতো মুখ = চাঁদমুখ।

ঘ) রূপক কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য এত নিবিড় হয় যে, উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন— মন রূপ মাঝি = মনমাঝি। এখানে 'মন' উপমেয় ও 'মাঝি' উপমান। 'মন' ও 'মাঝি'র মধ্যে সাদৃশ্য এত নিবিড় হয়েছে যে, দুটি বস্তুকে ভিন্ন কল্পনা করা যায় না। ঠিক এইভাবে ভবনদী, বিষাদসিন্ধু, কথামৃত, জীবনতরু, ভারতজননী ইত্যাদি হয়েছে।

৫. দ্বিগু সমাস : দ্বিগুও একপ্রকার তৎপুরুষ সমাস। যে তৎপুরুষ সমাসের সংখ্যাবাচক পদ বসে এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন—

পঞ্চবটের সমাহার = পঞ্চবটী।
চারটি রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা।
তিনটি কড়ির বিনিময়ে ক্রীত = তিনকড়ি।

৬. বহুব্রীহি সমাস : যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান না হয়ে, তৃতীয় একটি অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ, পূর্বপদটি 'নীল' অর্থাৎ 'বিষ', পরপদটি 'কণ্ঠ'। সমাসবদ্ধ হয়ে হয়েছে 'নীলকণ্ঠ'। সমাসবদ্ধ পদটিতে 'নীল' বা 'বিষ' কিংবা 'কণ্ঠ' না বুঝিয়ে, যার কণ্ঠে বিষ থাকে অর্থাৎ মহাদেব শিবকে বোঝানো হয়েছে। অতএব দেখা গেল যে, পূর্বপদ বা পরপদের অর্থ প্রধান না হয়ে, তৃতীয় একটি পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইভাবেই পীতাম্বর, বীণাপাণি, ব্রজপাণি ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাস হয়েছে।

বহুব্রীহি সমাসও কয়েক প্রকারের হয়। যেমন— সমানাধিকরণ, ব্যাধিকরণ, ব্যাতিহার, মধ্যপদলোপী, অলুক্, নঞর্থক ইত্যাদি।

ক) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হয় এবং দুটি পদই সমান অর্থাৎ প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হয়,

আর একই বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি বলা হয়। যেমন পীত অম্বর যার = পীতাম্বর। পক্ক কেশ যার = পক্ককেশ।

আবার অনেক সময় সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদটি বিশেষ্য হয়েও বিশেষণ-স্থানীয় রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ভূতেদের নাথ যিনি = ভূতনাথ, মেঘ বাহন যার = মেঘবাহন ইত্যাদি।

খ) ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ ও উত্তরপদ দুটিই বিশেষ্য এবং যার উত্তরপদ সবসময়ই সপ্তমী বিভক্তি হয়, তাকে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি বলে। যেমন— শূল পাণিতে যার = শূলপাণি, ঘরে মুখ যার = ঘরমুখো।

গ) ব্যাতিহার বহুব্রীহি : পরস্পর-সাপেক্ষ ক্রিয়া বা পরস্পর ক্রিয়া-বিনিময় বোঝাতে যে বহুব্রীহি সমাসে একই পদ দ্বিত্ব হয়ে পূর্বপদ ও পরপদ রূপে বসে, তাকে ব্যাতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি ; কানে কানে যে কথা = কানাকানি।

ঘ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের ব্যাখ্যানমূলক মধ্যবর্তী পদগুলি লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন— দরিয়ার মতো প্রশস্ত দিল (হৃদয়) যার = দিলদরিয়া ; মৃগের নয়নের মতো নয়ন যে নারীর = মৃগনয়না। এরূকম সোনামুখি, কমলাক্ষ প্রভৃতি।

ঙ) অলুক্ বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে বিভক্তির চিহ্ন লোপ হয় না তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন : গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়ে হলুদ। এরূপ— হরির উদ্দেশে লুট দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হরির লুট ইত্যাদি।

চঃ নঞ্ বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে নঞর্থক নির্ বা নি যুক্ত পূর্বপদ থাকে তাকে নঞ্ বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন নাই টোল যার = নিটোল; নাই রস যার = নীরস ; নেই ভুল যাতে = নির্ভুল ইত্যাদি।

৫। রচনা লিখন—